মু ক্তি যু দ্ধ

মুক্তিযুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা

পর্ব-৭

মু ক্তি যু দ্ধ

মুক্তিযুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা

পর্ব-৭

সংকলক

মো. মাসুদুল করিম অরিয়ন

সভাপতি ও উদ্যোক্তা

(মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস সংরক্ষণ কমিটি বাংলাদেশ)

সম্পাদক

বীর মুক্তিযোদ্ধা মিজানুর রহমান বাচ্চু

(যুদ্ধকালীন গ্রুপ কমান্ডার, ৯ নং সেক্টর)

সিনিয়র সহ-সভাপতি, নারায়নগঞ্জ জেলা আওয়ামীলীগ

উপদেষ্টা, মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস সংরক্ষণ কমিটি বাংলাদেশ

মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস সংরক্ষণ কমিটি বাংলাদেশ

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০২২

প্রথম মুদ্রন : ৫০০০ কপি

স্বত্ব

মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস সংরক্ষণ কমিটি বাংলাদেশ

অলংকরণ

আয়শা নকীব

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

মো. ইমরান হোসেন

প্রচ্ছদ

মো. আবিদুল্লাহ

ISBN : 978-984-91094-7-1

সৌজন্য

নতুন প্রজন্মের কাছে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা ইতিহাস তুলে ধরে
তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ
মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস সংরক্ষণ কমিটি বাংলাদেশ এর কর্মকাণ্ডের অংশ

উ ৎ স র্গ

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
ও
৭১ এর সকল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিত

মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির হাজার বছরের কালজয়ী ও সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। অসীম সাহসীকতা, বীরত্ব, আত্মত্যাগ আর অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট উৎরে যাওয়ার এক বড় ক্যানভাস। মুক্তিযুদ্ধের অনেক ইতিহাসই রচিত হয়েছে তবে এর সূর্যসৈনিক যারা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ডাকে সাড়া দিয়ে নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাদের ইতিহাস সংরক্ষীত নেই। কিন্তু তারা বাঙালি জাতির বীর ও সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়তে হলে সেই সব অকুতোভয় কালজয়ী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা ইতিহাস সংরক্ষণ অত্যান্ত জরুরী এবং আগামী প্রজন্মের কাছে এই মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম সাহসীকতা, বীরত্বগাথা আত্মত্যাগের ইতিহাস পৌঁছে দেয়া তোমাদেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য। আমরা দিয়েছি স্বাধীনতা আর সেই চেতনায় তোমরা উদ্বুদ্ধ করবে নতুন প্রজন্মকে যুগে যুগে। তাহলেই বঙ্গবন্ধুর আদর্শের আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সোনার বাংলা গড়ে উঠবে।

মাসুদুল করিম অরিয়ন (সভাপতি ও উদ্যোক্তা, "মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস সংরক্ষণ কমিটি বাংলাদেশ" স্বউদ্যোগে মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যক্তিগত যুদ্ধেও বীরত্বগাথা ইতিহাস সংরক্ষণ, প্রত্যক্ষদর্শীর যুদ্ধের বর্ণনা ও মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনচিত্র বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে ওয়েবসাইট www.mssangsad.com ও বই আকারে প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে কাজ করে যাচ্ছে। ৩,৩৭৫ টিরও বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে "মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা", বাস্তবায়ন সহ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিচারণা নিয়ে রচিত "মুক্তিযুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা পর্ব-১,২,৩,৪,৫,৬,৭...." প্রকাশ করে বিভিন্ন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরে তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে আসছে। ভুয়াদের যুদ্ধের কোন বীরত্বগাথা নেই, আর এরা দেশের শত্রু ও দেশের জনগণের সম্পদ বিনষ্টকারী।

পরিশেষে সরকার ও স্বাধীনতার স্বপক্ষের প্রত্যেক ব্যক্তিবর্গের কাছে মাসুদুল করিম অরিয়ন এর এই দেশপ্রেম মূলক সকল কর্মকাণ্ডে সার্বিক সহযোগীতা কামনা করছি।

ধন্যবাদান্তে

বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. মিজানুর রহমান বাচ্চু (যুদ্ধকালীন গ্রুপ কমান্ডার, ৯ নং সেক্টর)
সিনিয়র সহ-সভাপতি নারায়নগঞ্জ জেলা আওয়ামীলীগ
উপদেষ্টা-মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস সংরক্ষণ কমিটি বাংলাদেশ

সূ চি প ত্র

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ১১
বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক এম.পি. ॥ ৩৩
বীর মুক্তিযোদ্ধা এ.বি.এম. রুহুল আমিন হাওলাদার ॥ ৩৮
বীর মুক্তিযোদ্ধা মিজানুর রহমান বাচ্চু ॥ ৪৮
যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আহসান আলী খান ॥ ৫৬
বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আব্দুল মমিন সরকার ॥ ৭০
বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের মো. মুনির উদ্দিন ॥ ৯৭
বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব শেখ মুহাম্মদ ইসহাক ॥ ১০৬
বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব মো. আকরাম আলী ॥ ১১০
বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল আমিন কাউসার ॥ ১২০
বীর মুক্তিযোদ্ধা মোড়ল বজলুল করিম ॥ ১২৪

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস

পটভূমি

আমাদের জাতীয় ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম অধ্যায় হলো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। এই মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্মলাভ করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

পাকিস্তান নামের রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করা হয়। ১২ আগস্ট প্রকাশিত র‍্যাডক্লিপ রোয়েদাদে পূর্ব বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে সীমানা আনুষ্ঠানিকভাবে নির্ধারিত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হলো ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট। পূর্ব বাংলা হয় পাকিস্তানের অংশ-পূর্ব পাকিস্তান। পূর্ব থেকে জনগণ আশা করেছিলেন, এবার তাঁদের আশা-আকাঙ্খা পূরণ হবে। তাঁদের প্রত্যাশিত স্বাধীনতা নতুন রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হবে। উন্নত জীবনের অধিকারী হবেন। কিছুদিনের মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ অনুভব করলেন, তাদের প্রত্যাশা পূর্ণ হওয়ার নয়। পাকিস্তানের শাসকবর্গ বহুবাচনিক সমাজে পূর্ব পরিকল্পিত ঐক্যবদ্ধ একক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র করেছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অংশগ্রহণের ক্ষেত্র সংকুচিত করা হচ্ছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁরা বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। এমন কি পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এভাবে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতা সংগ্রামরে পটভূমি তৈরি হয়। ১৯৫২ সালে নিজস্ব ভাষার অধিকার রক্ষার জন্য জীবন দান করতে হয় পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র জনতার। ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে ক্ষমতা দখল করে। ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষে ছয় দফা দাবি পেশ করেন। ছয় দফা ম্যান্ডেট নিয়ে পাকিস্তানে ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করে আওয়ামী লীগ। পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে তার উত্তরণ ঘটে। জনগণ প্রত্যাশা করেছিল নির্বাচিত রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে পূর্ব পাকিস্তানের দীর্ঘদিনের বঞ্চনার ইতিহাসের গতি পাল্টাবেন। পাকিস্তানের শাসকবর্গ-কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং কিছু সামরিক কর্মকর্তা-ষড়যন্ত্রের গ্রন্থিগুলো এমনভাবে বিন্যস্ত করেন যেন শাসন ক্ষমতা কোনক্রমে বাঙালির হস্তগত না হয়। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তা সঠিকভাবে

অনুধাবন করেন।

ভাষা আন্দোলন

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে আসছলি। পাকিস্তান সরকার এ যৌক্তিক দাবির সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে ১৯৪৮ সালেই উর্দুকে একমাত্র সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা করে। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান প্রতিবাদ চলতে থাকে যা পরবর্তীতে ভাষা আন্দোলন নামে পরিচিতি লাভ করে। এ আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত হয় ১৯৫২ সালে এবং সেই বছরের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষার দাবিতে ঢাকা বিশববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ছাত্ররা একত্রিত হয়। পুলিশ এ জনসমাবেশের উপর গুলি চালানোর ফলে রফিক, সালাম, বরকত, জববার সহ আরো অনেকে শহীদ হয়। এই ঘটনা আন্দোলনকে এক নতুন মাত্রা দান করে এবং রাজনৈতিক গুরুত্ব বহুমাত্রায় বাড়িয়ে দেয়। ১৯৫৬ সালে চূড়ান্তভাবে সংবিধানে বাংলাকে উর্দূর পাশাপাশি অন্যতম প্রধান জাতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ভাষা আন্দোলনকে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান হিসেবে উল্লেখ করা হয় এবং ৬ দফা আন্দোলন, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট সাধারণ নির্বাচন ও ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন

১৯৫৪ সালে ১০ই র্মাচ পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ববঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করে। কিন্তু পাকিস্তান শাষকগোষ্ঠী বাঙালির এই আধিপত্য মেনে নিতে পারেনি। মাত্র আড়াই মাসের মধ্যে ৩০শে মে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয়। ১৯৫৯ সালে সমগ্র পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনের সময় নির্ধারিত হলে বাঙালিদের মধ্যে বিপুল সাড়া দেখা দেয়। জনসংখ্যার ৫৬ ভাগ বাঙালি, অতএব এই নির্বাচনের ফলাফল চিন্তা করে কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। একই সময়ে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখলের কৌশলে কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যেও বিরোধ সৃষ্টি করে। এই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হয়। ১৯৬২ সালে সামরিক শাসন তুলে নেয়া হ'লে ছাত্র সমাজ অধিকারের দাবিতে পুনরায় আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়।

১৯৬২ সালের শিক্ষা সংকোচন নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন

আন্দোলন নতুন করে গণ-আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়। শিক্ষা সংকোচন নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনরত ছাত্র মিছিলের উপর পুলিশের গুলিতে ১৭ই সেপ্টেম্বর নিহত হন যার মধ্যে ওয়াজিউল্লা, মোস্তফা ও বাবুল অন্যতম। ছাত্র সমাজের ২২ দফা

দাবিকে কেন্দ্র করে ১৭ই সেপ্টেম্বর ৬৩ 'শিক্ষা দিবস' পালন উপলক্ষে দেশব্যাপী দুর্বার আন্দোলন গড়ে ওঠে। রাজনৈতিক দলসমূহ ও বুদ্ধিজীবী সমাজ ছাত্রদের এই আন্দোলনের সবরকম সমর্থন নিয়ে এগিয়ে আসে।

ছাত্র সমাজের সশস্ত্র আন্দোলনের প্রস্তুতি

পাকিস্তানের কাঠামোয় বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশ ঘটা অসম্ভব বিবেচনা করে তৎকালীন ছাত্র সমাজের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন ১৯৬২ সালে গোপনে ছাত্রদের সংগঠিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ এই ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্ব দেন জনাব সিরাজুল আলম খান, জনাব আবদুর রাজ্জাক এবং কাজী আরেফ আহমেদ। এই সংগঠন 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' নামে পরিচিত ছিল।

৬৬ এর ৬ দফা আন্দোলন

১৯৬৫ সালে পাকভারত যুদ্ধের সময়কালে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয় পূর্ব বাংলা সম্পূর্ণভাবে অরক্ষিত ছিল। স্পষ্ট হয়ে ওঠে পাকিস্তানের সামরিক শাসকগণ সামাজিক, সাংস্কৃতিক নিপীড়ন ও অর্থনৈতিক শোষণের ধারাবাহিকতায় পূর্ববাংলার নিরাপত্তা ব্যবস্থার ন্যূনতম উন্নতি করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেনি। বাঙালিদের প্রতি জাতিগত এই বৈষম্যের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে ১৯৬৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী লাহোরে আহুত 'সর্বদলীয় জাতীয় সংহতি সম্মেলন' শেখ মুজিবর রহমান ৬ দফা দাবী উপস্থাপন করেন। ভাষণে তিনি বলেন, 'গত দুই যুগ ধরে পূর্ব বাংলাকে যেভাবে শোষণ করা হয়েছে তার প্রতিকারকল্পে এবং পূর্ব বাংলার ভৌগোলিক দূরত্বের কথা বিবেচনা করে আমি ৬ দফা প্রস্তাব উত্থাপন করছি।' পরবর্তীতে এই ৬ দফা দাবি বাঙালি জাতির মুক্তিসনদ হিসাবে বিবেচিত হয়।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সামরিক বাহিনীর কিছু সংখ্যক সদস্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেমের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের এক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। সংগঠনের কোন এক সদস্যের অসতর্কতার ফলে পাকিস্তান সরকারের কাছে এই পরিকল্পনার কথা ফাঁস হয়ে পড়ে। পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তান সরকার সামরিক বেসামরিক ২৮ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। ১৯শে জুন '৬৮ পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবর রহমানসহ ৩৫ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে এক রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা দায়ের করে। এই মামলা 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে পরিচিত।

১৯শে জুন ১৯৬৮, ঢাকা সেনানিবাসে এই মামলার বিচার শুরু হয়। বিচার কার্য চলার সময় থেকে শ্লোগান ওঠে- 'জেলের তালা ভাঙব- শেখ মুজিবকে আনব।' এই গণ-আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় বলা যায়, এই সময় সমস্ত দেশব্যাপী সরকার বিরোধী আন্দোলন পূর্ণতা লাভ করে।

৬৯ এর গণ-আন্দোলন

পূর্ব-বাংলার স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনগুলোর সমন্বয়ে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে ওঠে। রাজনৈতিক শ্লোগান পরিবর্তিত হয়। 'তোমার আমার ঠিকানা- পদ্মা মেঘনা যমুনা।' পিন্ডি না ঢাকা- ঢাকা ঢাকা। 'জাগো জাগো-বাঙালি জাগো'। এই ধারাবাহিকতায় স্বায়ত্বশাসনের আন্দোলন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পথকে উন্মুক্ত করে। অহিংস আন্দোলন সহিংসতার দিকে ধাবিত হতে থাকে। এই সময় রাজনৈতিক দলের ৬ দফা দাবি গণদাবিতে পরিণত হয়। বাঙালি একক জাতিসত্তার আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জেনারেল আইয়ুব খান দেশে সামরিক শাসন জারি করে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এই গণ-আন্দোলনের সময় পুলিশের গুলিতে ২০শে জানুয়ারী' ৬৯ ছাত্র আসাদুজ্জামান এবং ২৪শে জানুয়ারী'৬৯ স্কুল ছাত্র মতিউর রহমান মৃত্যুবরণ করে। ছাত্র আন্দোলনের ভূমিকায় শহীদ আসাদ-মতিউর দুটি উল্লেখযোগ্য নাম। শেরে বাংলা নগর ও মোহাম্মদপুরের সংযোগ স্থলের আইয়ুব গেটের নাম পরিবর্তন করে 'আসাদ গেট' এবং বঙ্গভবনের সামনের উদ্যানের নাম 'মতিউর রহমান শিশু উদ্যান' করা হয়। জানুয়ারী ৬৯ এ গৃহিত ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলনকে আরও বেগবান করে।

১৫ই ফেব্রুয়ারি ৬৯ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গুলিতে আহত অবস্থায় বন্দী আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হক মৃত্যুবরণ করেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারি ৬৯ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ডঃ শামসুজ্জোহা পুলিশের গুলিতে নিহত হন। এই মৃত্যু সংবাদ গণ-আন্দোলনে আরেকটি নতুন মাত্রা যুক্ত করে। প্রচণ্ড-আন্দোলনের মুখে পাকিস্তান সরকার ২১শে ফেব্রুয়ারি ৬৯ এই মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। ২২শে ফেব্রুয়ারি ৬৯, শেখ মুজিবর রহমানসহ অভিযুক্ত সকলেই ঢাকা সেনানিবাস থেকে মুক্তি লাভ করেন। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির একক এবং অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারি ৬৯ সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক বিশাল গণ-সম্বর্ধনায় শেখ মুজিবর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

এই মামলায় অভিযুক্ত ও বন্দী অবস্থায় সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত সার্জেন্ট জহুরুল হক ও ডঃ শামসুজ্জোহাকে জাতি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। উভয়েই স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক হিসাবে চিহ্নিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সার্জেন্ট জহুরুল হক হল' ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শামসুজ্জোহা হল' তাদের স্মরণে নামকরণ করা হয়েছে।

৬৯ এর এই ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, কাজী আরেফ আহমেদ, আবদুর রউফ, খালেদ মোহাম্মদ আলী, তোফায়েল আহমেদ, আসম আবদুর রব, নূরে আলম সিদ্দিকী, শাহজাহান সিরাজ, সামসুদ্দোহা, মোস্তফা জামাল হায়দর, রাশেদ খান মেনন, বেগম মতিয়া চৌধুরী, দীপা দত্ত, হায়দর আকবর খান রণোসহ অনেকে।

রাজনৈতিক দলীয় প্রধান যাদের নিরলস পরিশ্রম ও নির্দেশনায় বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের এই আন্দোলন পূর্ণতা লাভ করেছিল তাদের মধ্যে জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান, কমরেড মনি সিং, অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ, শ্রীমনোরঞ্জন ধর অন্যতম।

৭০ এর সাধারণ নির্বাচন

২৫শে মার্চ ৬৯ সারা দেশে সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর হলেও সামরিক সরকার গণ-দাবিকে উপেক্ষা করার মত শক্তি সঞ্চয় করতে পারেনি। তাই প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান সারা দেশে এক ব্যক্তি এক ভোটের নীতিতে সাধারণ নির্বাচন দিতে বাধ্য হন। ৭ই ডিসেম্বর '৭০ থেকে ১৯শে ডিসেম্বর' ৭০ এর মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে তফসিল ঘোষণা করা হয় এবং শান্তিপূর্ণভাবে দেশব্যাপী এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ৬ দফা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে রায় প্রদান করে। এই নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে ৩১০ আসনের মধ্যে ১৬৭ আসনে জয়লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের ম্যান্ডেট লাভ করে।

'বাঙালির শাসন মেনে নেওয়া যায় না' এই নীতিতে পাকিস্তানি সামরিক শাসকগণ নির্বাচিত এই জন প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিবন্ধক হয়ে উঠে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলার জাতীয় নেতৃবৃন্দ এর প্রতিবাদে রুখে দাঁড়ায়। শুরু হয় অধিকারের সংঘাত। ছাত্র সমাজ এই আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করে। ৭০ এ বঙ্গবন্ধু এক কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে পূর্ব বাংলার ম্যাপ অংকিত একটি পতাকা প্রদান করেন। এই পতাকাই পরবর্তীতে বাংলাদেশের পতাকা হিসাবে গৃহীত হয়। ছাত্রদের এই সংগঠন প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে প্রতিটি জেলা ও মহকুমা শহরে শুরু হয় সামরিক প্রশিক্ষণের মহড়া। জাতীয়তাবাদী এই আন্দোলনে ছাত্র

ও যুব সমাজের অংশগ্রহণ জন সমাজকে আরো উৎসাহিত করে তোলে।

৭১ এর অসহযোগ আন্দোলন

নির্বাচনে জয়লাভের পর পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সরকার গঠনে মত দিতে অস্বীকার করেন। একটি রাজনৈতিক দল জনগণের ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠনের ম্যান্ডেট পেয়েছে। তারা সরকার গঠন করবে, এটাই ছিল বাস্তবতা। কিন্তু সামরিক শাসকগণ সরকার গঠন বা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া বাদ দিয়ে এক আলোচনা শুরু করে। কিসের জন্য আলোচনা, এটা বুঝতে বাঙালি নেতৃবৃন্দের খুব একটা সময় লাগেনি। জাতীয় সংসদের নির্ধারিত অধিবেশন স্থগিতের প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু ১লা মার্চ ১৯৭১ দেশব্যাপী অসহযোগের আহবান জানান। সর্বস্তরের জনগণ একবাক্যে বঙ্গবন্ধুর এই আহবানে সাড়া দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে অচল করে তোলে। ২রা মার্চ ৭১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের পতাকা প্রদর্শিত হয়। ৩রা মার্চ '৭১ এ রমনা রেসকোর্স (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) 'স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' এর পক্ষ থেকে 'স্বাধীনতার ইসতেহার' পাঠ করা হয়। এই ইসতেহারে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রেখে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

পাকিস্তান সামরিক বাহিনী পরিচালিত সরকার জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে কোন সমাধান না দেওয়ায়, ৭ই মার্চ ১৯৭১ বঙ্গবন্ধু রহমান রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) সমগ্র বাঙালি জাতিকে এক দিকনির্দেশনী ভাষণে সর্বপ্রকার পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হতে আহবান জানান। এই ভাষণে তিনি বলেন, "আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল। ... এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।" বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দের ভাষণগুলির মধ্যে অন্যতম একটি হিসাবে বিবেচিত।

৭ই মার্চের এই ভাষণে বঙ্গবন্ধুর এই নির্দেশ কোন দলীয় নেতার নির্দেশ ছিল না। ছিল একজন জাতীয় নেতার নির্দেশ। এই নির্দেশ দেশের সর্বস্তরের ছাত্র, জনতা ও বুদ্ধিজীবীদের সাথে বাঙালি সামরিক, বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী সকলকেই সচেতন করে তোলে। ২রা মার্চ ৭১ থেকে পূর্ব বাংলার সমস্ত প্রশাসনিক কাজকর্ম চলতে থাকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে।

২৩শে মার্চ ৭১ সকালে পল্টন ময়দানে জয় বাংলা বাহিনীর এক কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান শেষে এই বাহিনীর নেতৃবৃন্দ মিছিল সহকারে বাংলাদেশের পতাকাসহ বঙ্গবন্ধু ভবনে প্রবেশ করে আনুষ্ঠানিকভাবে বাড়িতে এই পতাকা উত্তোলন করেন। একই সাথে বঙ্গবন্ধুর গাড়িতে এই পতাকা লাগান হয়। ২৩শে মার্চ পূর্ব বাংলার প্রতিটি শহরে পাকিস্তান দিবসের অনুষ্ঠান বর্জিত হয় এবং পাকিস্তানের পতাকার পরিবর্তে বাংলাদেশের পতাকা উড়তে দেখা যায়।

অন্যদিকে ক্ষমতার হস্তান্তরের নামে এই আলোচনা চলা অবস্থায় পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো সৃষ্ট সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের পরিবর্তে নতুন করে সংকটের সৃষ্টি করে। অযৌক্তিক দাবি উপস্থাপনের ফলে সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধানের পথ এক সময় রুদ্ধ হয়ে পড়ে। পাকিস্তান সামরিক শাসকগণ স্বার্থান্বেষী মহলের সাথে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সামরিক ক্ষমতা প্রয়োগের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। একটি পরিকল্পিত হত্যাকান্ডের জন্য রাজনৈতিক আলোচনার আড়ালে সামরিক বাহিনী মাত্র ২২ দিনে দুই ডিভিশন অবাঙালি সৈন্য পাকিস্তান থেকে পূর্ব বাংলায় স্থানান্তরে সক্ষম হয়। বাস্তবতায় এটিই ছিল তাদের আলোচনার নামে কালক্ষেপণের মূল উদ্দেশ্য। ২৪শে মার্চ ৭১ সামরিক শাসকগণ হেলিকপ্টার যোগে সমস্ত সেনানিবাসে এই আক্রমণের পরিকল্পনা হস্তান্তর করে। বাঙালি জাতির উপর পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর এই কুখ্যাত হত্যাযজ্ঞের নির্দেশ নামা "অপারেশন সার্চ লাইট" নামে পরিচিতি।

২৫শে মার্চ ৭১ রাত্র ১১টায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিত আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়ে সেনানিবাস অথবা আক্রমণ প্রস্তুতিস্থানগুলি ত্যাগ করে। একই সাথে ঢাকাসহ দেশের সমস্ত বড় শহর ও সেনানিবাসের বাঙালি রেজিমেন্টসমূহ আক্রান্ত হয়। সেনাবাহিনীর হাতে বঙ্গবন্ধু রাত ১২টা ৩০ মিনিটে ধানমন্ডি বাসভবন থেকে বন্দী হবার পূর্বে তিনি দলীয় নেতৃবন্দেকে করণীয় বিষয়ে যথাযথ নির্দেশ দিয়ে অবস্থান পরিবর্তনের কথা বলেন। একই সাথে তিনি বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণা বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারিত হয়।

অপারেশন সার্চলাইট ও ২৫ মার্চের গণহত্যা

২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের বড় শহরগুলোতে গণহত্যা শুরু করে। তাদের পূর্বপরিকল্পিত এই গণহত্যাটি ''অপারেশন সার্চলাইট'' নামে পরিচিত। এ গণহত্যার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আগে থেকেই পাকিস্তান আর্মিতে কর্মরত সকল বাঙালি অফিসারদের হত্যা কিংবা গ্রেফতার করার চেষ্টা করা হয়। ঢাকার পিলখানায়, ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রামের ই বি আর সিসহ সারাদেশের সামরিক আধাসামরিক সৈন্যদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকান্ডের কথা যেন বহির্বিশব না

জানতে পারে সে জন্য আগেই সকল বিদেশি সাংবাদিকদের গতিবিধির উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয় এবং অনেককে দেশ থেকে বের করে দেয়া হয়। তবে ওয়াশিংটন পোস্টের বিখ্যাত সাংবাদিক সাইমন ড্রিং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাংলাদেশের রিপোর্ট প্রকাশ করেন। এর মধ্য দিয়ে বিশ্ব এই গণহত্যা সম্পর্কে অবগত হয়। আলোচনার নামে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কালক্ষেপণও এই গণহত্যা পরিকল্পনারই অংশ ছিল।

২৫ মার্চ রাত প্রায় সাড়ে এগারোটার দিকে পাকিস্তানি বাহিনী তাদের হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। পাকিস্তানিদের অপারেশনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ঢাকা বিশববিদ্যালয়ের সার্জেন্ট জহুরুল হক হল এবং জগন্নাথ হলের ছাত্রদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়। ঢাকা বিশববিদ্যালয় ও আশেপাশের বহু সংখ্যক শিক্ষক ও সাধারণ কর্মচারিদেরও হত্যা করা হয়। পুরোনো ঢাকার হিন্দু সম্প্রদায় অধ্যুষিত এলাকাগুলোতেও চালানো হয় ব্যাপক গণহত্যা। রাজারবাগ পুলিশ লাইনে আক্রমণ করে হত্যা করা হয় পুলিশ বাহিনীর বহু সদস্যকে। পিলখানার ইপিআর-এর কেন্দ্রে আচমকা আক্রমণ চালিয়ে নির্বিচারে হত্যা করা হয় নিরস্ত্র সদস্যদের। কয়েকটি পত্রিকা অফিস ভস্মীভূত করা হয়। দেশময় ত্রাস সৃষ্টির লক্ষ্যে নির্বিচারে হত্যা করা হয় বিভিন্ন এলাকায় ঘুমন্ত নর-নারীকে। হত্যা করা হয় শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিদেরও। ধারণা করা হয়, সেই রাত্রিতে একমাত্র ঢাকা ও তার আশে পাশের এলাকাতে প্রায় এক লক্ষ নিরীহ নর-নারীর জীবনাবসান ঘটে।

স্বাধীনতার ঘোষণাঃ

তিনি পাকিস্তানি সশস্ত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রামের জন্য বাংলার জনগণকে আহবান জানান। চট্রগ্রামে তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে প্রচারের জন্য পাঠানো হয়। ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু ঘোষণাকে অবলম্বন করে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতা এম. এ হান্নান স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। ২৭ মার্চ অপরাহ্নে চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে ৮ম ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পক্ষে স্বাধীনতার আরেকটি ঘোষণা পাঠ করেন। এই ঘোষণাটিতে তিনি উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, নবগঠিত এই রাষ্ট্রের সরকার জোটবদ্ধ না হয়ে বিশেবর অপর রাষ্ট্রগুলোর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টিতে আগ্রহী। এছাড়াও এ ঘোষণায় সারা বিশেবর সরকারগুলোকে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলারও আহ্বান জানানো হয়। (বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিলপত্র: মুজিবনগর প্রশাসন, তৃতীয় খণ্ড, প্রকাশকাল: নভেম্বর ১৯৮২)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন

১০ই এপ্রিল ৭১ নির্বাচিত সাংসদগণ আগরতলায় একত্রিত হয়ে এক সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে সরকার গঠন করেন। এই সরকার স্বাধীন সার্বভৌম "গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার'।" স্বাধীনতার সনদ (Charter of Independence) বলে এই সরকারের কার্যকারিতা সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত হয়। ১৭ই এপ্রিল ৭১ মেহেরপুর মহকুমার ভবেরপাড়া গ্রামে বৈদ্যনাথ তলায় "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার" আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির এই সরকারের মন্ত্রী পরিষদ সদস্যদের শপথ পাঠ করান জাতীয় সংসদের স্পীকার অধ্যাপক ইউসুফ আলী। যে সমস্ত নেতৃবৃন্দকে নিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয় তাঁরা হলেন :

১. রাষ্ট্রপতি : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (পাকিস্তানে বন্দি)
২. উপ-রাষ্ট্রপতি : সৈয়দ নজরুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি)
৩. প্রধানমন্ত্রী : তাজউদ্দিন আহমেদ (প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত)
৪. অর্থমন্ত্রী : ক্যাপ্টেন মনসুর আলী (শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত)
৫. পররাষ্ট্রমন্ত্রী : খন্দকার মোশতাক আহমেদ (আইন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত)
৬. স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী : এ এইচ এম কামরুজ্জামান (ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত)

এই অনুষ্ঠানে উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসাবে (বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে) এবং কর্নেল এম এ জি ওসমানী মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন বলে সরকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দেশ বিদেশের শতাধিক সাংবাদিক ও হাজার হাজার দেশবাসীর উপস্থিতিতে এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাংসদ জনাব আবদুল মান্নান। নবগঠিত সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতিকে আনুষ্ঠানিকভাবে গার্ড অব অনার দেয়া হয়। বাঙালির প্রাণপুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে এই স্থানটির নামকরণ করা হয় "মুজিব নগর"।

মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি জনযুদ্ধ। দেশের সর্বস্তরের মানুষ এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। রাজনৈতিকভাবে এই যুদ্ধকে সার্বজনীন করার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সর্বসম্মতিক্রমে একটি "সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদ" গঠন করেন। এই উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন :

ক. জনাব আব্দুল হামিদ খান ভাসানী (সভাপতি)– ন্যাপ ভাসানী
খ. শ্রী মনি সিং (সভাপতি)– বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি

গ. অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ (সভাপতি)– ন্যাপ মোজাফ্ফর
ঘ. শ্রী মনোরঞ্জন ধর (সভাপতি)– বাংলাদেশ জাতীয় কংগ্রেস
ঙ. জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ (প্রধানমন্ত্রী)– পদাধিকারবলে
চ. খন্দকার মোশতাক আহমেদ (পররাষ্ট্রমন্ত্রী)– পদাধিকারবলে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ৯ মাসব্যাপী সশস্ত্র এই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন। মুক্তিবাহিনীর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, অস্ত্র গোলাবারুদ সরবরাহ, খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থাসহ সরকার প্রায় এক কোটি শরণার্থীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। কূটনৈতিক দক্ষতার মাধ্যমে বিশ্বের কাছে মুক্তিযুদ্ধের বাস্তবতায় উপস্থাপনসহ এবং একটি সময় উপযোগী প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলতে সক্ষম হন।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগী রাজাকারদের অত্যাচারে প্রায় এক কোটি বাঙালি দেশ ত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ভারত সরকার ও ভারতের জনগণ দেশত্যাগী এই জনগোষ্ঠীর সার্বিক সাহায্যে এগিয়ে আসেন। ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা দান করেন।

মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক কাঠামোয় কর্মরত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ

১. যে সমস্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব প্রশাসনিক কাঠামোয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন :
   ক. রাষ্ট্রপতির পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব আবদুস সামাদ আজাদ, এম এন এ
   খ. প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম, এম এন এ
   গ. তথ্য মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত জনাব আবদুল মান্নান, এম এন এ
   ঘ. জয় বাংলা পত্রিকার উপদেষ্টা জনাব জিল্লুর রহমান, এম এন এ
   ঙ. যুব শিবির নিয়ন্ত্রণ পরিষদ চেয়ারম্যান অধ্যাপক ইউসুফ আলী, এম এন এ

২. বেসামরিক প্রশাসন :
   ক. ক্যাবিনেট সচিব : জনাব হোসেন তৌফিক ইমাম (এইচ টি ইমাম)
   খ. মুখ্য সচিব : জনাব রুহুল কুদ্দুস
   গ. সংস্থাপন সচিব : জনাব নূরুল কাদের খান
   ঘ. অর্থ সচিব : জনাব খন্দকার আসাদুজ্জামান
   ঙ. পররাষ্ট্র সচিব : জনাব মাহাবুবুল আলম চাষী এবং জনাব আবুল ফতেহ
   চ. প্রতিরক্ষা সচিব : জনাব এম এ সামাদ
   ছ. স্বরাষ্ট্র সচিব : জনাব এ খালেক
   জ. স্বাস্থ্য সচিব : জনাব এস টি হোসেন

ঝ. তথ্য সচিব : জনাব আনোয়ারুল হক খান
ঞ. কৃষি সচিব : জনাব নুরউদ্দিন আহমেদ
ট. আইন সচিব : জনাব এ হান্নান চৌধুরী

৩. কুটনৈতিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ মুক্তিযুদ্ধকে বিশ্ববাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিলেন :
ক. মিশন প্রধান যুক্তরাজ্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী (বহিঃর্বিশ্বে সরকারের বিশেষ দূত)
খ. মিশন প্রধান কলিকাতা জনাব হোসেন আলী
গ. মিশন প্রধান নতুন দিল্লী জনাব হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী
ঘ. মিশন প্রধান যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা জনাব এম আর সিদ্দিকী
ঙ. মিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত ইরাক জনাব আবু ফতেহ
চ. মিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত সুইজারল্যান্ড জনাব অলিউর রহমান
ছ. মিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত ফিলিপাইন জনাব কে কে পন্নী
জ. মিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত নেপাল জনাব মোস্তাফিজুর রহমান
ঝ. মিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত হংকং জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ
ঞ. মিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত জাপান জনাব এ রহিম
ট. মিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত লাগোস জনাব এম এ জায়গীরদার

৪. স্বাধীন বাংলাদেশের গণমুখী প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো কি হবে সেই লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশে পরিকল্পনা কমিশন একটি রূপরেখা প্রণয়ন করে। যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি এই পরিকল্পনায় জড়িত ছিলেন তাঁরা হলেন :
ক. ডঃ মোজাফ্ফর আহমেদ চৌধুরী
খ. ডঃ মোশারাফ হোসেন
গ. ডঃ খান সরওয়ার মুরশিদ
ঘ. ডঃ এম আনিসুজ্জামান
ঙ. ডঃ স্বদেশ বোস।

৫. মুক্ত এলাকায় সুষ্ঠু প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা এবং ভারতে অবস্থান গ্রহণকারী শরণার্থীদের দেখাশুনা ও যুব শিবির পরিচালনার জন্য সরকার সমস্ত বাংলাদেশকে ১১টি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত করেন। প্রতিটি প্রশাসনিক এলাকায় চেয়ারম্যান ও প্রশাসক নিয়োগ করেন।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

মুক্তিযুদ্ধ সময়কালে যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের এবং অবরুদ্ধ এলাকার জনগণের মনোবল অক্ষুন্ন রাখার ক্ষেত্রে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র বিভিন্ন অনুষ্ঠানের

মধ্যদিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ সদস্যদের নীতি নির্ধারণী ভাষণসহ জনগণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন নির্দেশাবলী প্রচারিত হয়। প্রতিদিনের সংবাদসহ যে সমস্ত অনুষ্ঠান জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তার মধ্যে চরমপত্র ও জল্লাদের দরবার অন্যতম। যে সমস্ত ব্যক্তির অক্লান্ত পরিশ্রমে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তাঁরা হলেন :

সর্বজনাব এম এ মান্নান এম এন এ, জিল্লুর রহমান এম এন এ, শওকত ওসমান, ডঃ এ আর মল্লিক, ডঃ মযহারুল ইসলাম, ডঃ আনিসুজ্জামান, সিকান্দার আবু জাফর, কল্যাণ মিত্র, ফয়েজ আহমদ, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, এম আর আখতার মুকুল, তোয়াব খান, আসাদ চৌধুরী, কামাল লোহানী, আলমগীর কবীর, মহাদেব সাহা, আলী যাকের, সৈয়দ হাসান ইমাম, নির্মলেন্দু গুণ, আবুল কাসেম সন্দ্বীপ, বেলাল মোহাম্মদ, আবদুল জববার, আপেল মাহমুদ, রর্থীন্দ্রনাথ রায়, কাদেরী কিবরিয়া, ডাঃ অরূপ রতন চৌধুরী, রফিকুল ইসলাম, সমর দাস, অজিত রায়, রাজু আহামেদ, মামুনুর রশীদ, বেগম মুশতারী শফি, শাহীন মাহমুদ, কল্যাণী ঘোষ, ডালিয়া নওশীন, মিতালী মুখার্জী, বুলবুল মহলানবীশ, শামসুল হুদা চৌধুরী, আশফাকুর রহমান খান, সৈয়দ আবদুস সাকেরসহ অনেকে।

বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী

যে জনযুদ্ধ এনেছে পতাকা, সেই জনযুদ্ধের দাবিদার এদেশের সাত কোটি বাঙালি। একটি সশস্ত্র যুদ্ধ দেশকে শত্রুমুক্ত করে। এই সশস্ত্র যুদ্ধ একটি নির্বাচিত সরকারের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। পরিকল্পিত এই যুদ্ধ পরিচালনার জন্য ১০ই এপ্রিল '৭১ বাংলাদেশ সরকার সমগ্র বাংলাদেশকে ৪টি যুদ্ধঅঞ্চলে বিভক্ত করেন। এই ৪টি অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিনায়ক ছিলেনঃ

ক. চট্টগ্রাম অঞ্চল - মেজর জিয়াউর রহমান
খ. কুমিল্লা অঞ্চল - মেজর খালেদ মোশাররফ
গ. সিলেট অঞ্চল - মেজর কে এম সফিউল্লাহ
ঘ. দক্ষিণ পশ্চিম - অঞ্চল মেজর আবু ওসমান চৌধুরী

পরবর্তীতে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলকে বিভক্ত করে রাজশাহী অঞ্চলে মেজর নাজমুল হক, দিনাজপুর অঞ্চলে মেজর নওয়াজেস উদ্দিন এবং খুলনা অঞ্চলে মেজর জলিলকে দায়িত্ব দেয়া হয়। ৭ই জুলাই ৭১ যুদ্ধের কৌশলগত কারণে সরকার নিয়মিত পদাতিক ব্রিগেড গঠনের পরিকল্পনায় 'জেড ফোর্স' ব্রিগেড গঠন করেন।

এই জেড ফোর্সের অধিনায়ক হলেন লেঃ কর্নেল জিয়াউর রহমান। একই ভাবে সেপ্টেম্বর মাসে 'এস ফোর্স' এবং ১৪ই অক্টোবর 'কে ফোর্স' গঠন করা হয়। কে ফোর্সের অধিনায়ক ছিলেন লেঃ কর্নেল খালেদ মোশাররফ এবং এস ফোর্সের অধিনায়ক ছিলেন লেঃ কর্নেল কে. এম. সফিউল্লাহ।

১০ই জুলাই ৭১ থেকে ১৭ই জুলাই ৭১ পর্যন্ত মুক্তিবাহিনী সদর দপ্তরে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে যুদ্ধ অঞ্চলের অধিনায়কদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে বাংলাদেশকে ১১টি যুদ্ধ সেক্টরে বিভক্ত করে সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। এই কমান্ডারগণ ছিলেনঃ

সেক্টর অধিনায়ক যুদ্ধ এলাকা ও তথ্য

সেক্টর-এক : মেজর রফিকুল ইসলাম (চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলার ফেনী মহকুমার অংশ বিশেষ (মুহুরী নদীর পূর্বপাড় পর্যন্ত)। এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল পাঁচটি। সেক্টর ট্রুপস্ ছিল ২১০০ সৈন্য এবং গেরিলা ছিল ২০,০০০।

সেক্টর-দুই : মেজর খালেদ মোশাররফ (কুমিল্লা জেলার অংশ, ঢাকা জেলা ও ফরিদপুর জেলার অংশ এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল ছয়টি)। সেক্টর ট্রুপস্ ছিল ৪,০০০ সৈন্য এবং গেরিলা ছিল ৩০,০০০।

সেক্টর-তিন : মেজর কে এম শফিউল্লাহ (কুমিল্লা জেলার অংশ, ময়মনসিংহ জেলার অংশ, ঢাকা ও সিলেট জেলার অংশ)।এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল সাতটি। সেক্টর ট্রুপস্ ছিল ৬৬৯৩ সৈন্য এবং গেরিলা ছিল ২৫,০০০।

সেক্টর-চার : মেজর সি আর দত্ত (সিলেট জেলার অংশ। এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল ছয়টি)। সেক্টর ট্রুপস্ ছিল ৯৭৫ সৈন্য এবং গেরিলা ছিল ৯,০০০।

সেক্টর-পাঁচ : মেজর মীর শওকত আলী সিলেট জেলার অংশ ও ময়মনসিংহ জেলার অংশ। এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল ছয়টি। সেক্টর ট্রুপস্ ছিল ১৯৩৬ সৈন্য এবং গেরিলা ছিল ৯,০০০।

সেক্টর-ছয় : উইং কমান্ডার এম খাদেমুল বাশার রংপুর জেলা ও দিনাজপুর জেলার অংশ। এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল পাঁচটি। সেক্টর ট্রুপস্ ছিল ২৩১০ সৈন্য এবং গেরিলা ছিল ১১,০০০।

সেক্টর-সাত : মেজর নাজমুল হক রংপুর জেলার অংশ, রাজশাহী জেলার অংশ, পাবনা জেলার অংশ ও দিনাজপুর জেলার অংশ, বগুড়া জেলা। এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল নয়টি। সেক্টর ট্রুপস্ ছিল ২৩১০ সৈন্য এবং গেরিলা ছিল

১২,৫০০। সেপ্টেম্বর মাসে সড়ক দুর্ঘটনায় মেজর নাজমুল হক নিহত হওয়ার পর লেঃ কর্নেল কাজী নুরুজ্জামান সেক্টর অধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সেক্টর-আট : মেজর আবু ওসমান চৌধুরী যশোর জেলা, ফরিদপুর জেলা, কুষ্টিয়া জেলা, খুলনা ও বরিশাল জেলার অংশ। এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল সাতটি। সেক্টর ট্রুপস্ ছিল ৩৩১১ সৈন্য এবং গেরিলা ছিল ৮,০০০। ১৮ই আগস্ট লেঃ কর্নেল এম আবুল মঞ্জুর সেক্টর অধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সেক্টর-নয় : মেজর আবদুল জলিল বরিশাল জেলার অংশ, পটুয়াখালী জেলা, খুলনা, ফরিদপুর জেলার অংশ। এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল তিনটি। সেক্টর ট্রুপস্ ছিল ৩৩১১ সৈন্য এবং গেরিলা ছিল ৮,০০০।

সেক্টর-দশ : প্রধান সেনাপতির নিয়ন্ত্রণে (নৌ সেক্টর)সমগ্র বাংলাদেশ। এই সেক্টরটি গঠিত হয়েছিল নৌ-কমান্ডোদের দিয়ে। বিভিন্ন নদী বন্দর ও শত্রু পক্ষের নৌ-যানগুলোতে অভিযান চালানোর জন্য এঁদের বিভিন্ন সেক্টরে পাঠানো হতো। লক্ষ্যবস্তুর গুরুত্ব এবং পাকিস্তানিদের প্রস্তুতি বিশ্লেষণ করে অভিযানে সাফল্য নিশ্চিত করার বিষয়টি বিবেচনায় আনা হতো এবং তার ওপর নির্ভর করত অভিযানে অংশগ্রহণকারী দলসমূহে যোদ্ধার সংখ্যা কত হবে। যে সেক্টর এলাকায় কমান্ডো অভিযান চালানো হতো, কমান্ডোরা সেই সেক্টর কমান্ডারের অধীনে কাজ করত। নৌ-অভিযান শেষে তারা আবার তাদের মূল সেক্টর- ১০ নম্বর সেক্টরের আওতায় চলে আসত। নৌ-কমান্ডোর সংখ্যা ছিল ৫১৫ জন।

সেক্টর এগার : মেজর আবু তাহের। ময়মনসিংহ জেলার অংশ, সিলেট জেলার অংশ ও রংপুর জেলার অংশ। এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল সাতটি। সেক্টর ট্রুপস্ ছিল ২৩১০ সৈন্য এবং গেরিলা ছিল ২৫,০০০। মেজর আবু তাহের ১৪ নভেম্বর আহত হওয়ার পর এই সেক্টরের দায়িত্ব কাউকেও দেয়া হয়নি।

মুক্তিবাহিনী সদর দপ্তর

ক. প্রধান সেনাপতি মুক্তিবাহিনী কর্নেল এম এ জি ওসমানী

খ. সেনাবাহিনী প্রধান কর্নেল আবদুর রব

গ. বিমানবাহিনী প্রধান ও উপ-সেনা প্রধান গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার

ঘ. ডাইরেক্টর জেনারেল মেডিকেল সার্ভিস মেজর শামছুল আলম

পাকিস্তান সেনাবাহিনী ত্যাগ করে মোট ১৩১ জন অফিসার মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করেন ও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। ৫৮ জন তরুণ মুক্তিযোদ্ধা ভারতের মূর্তি অফিসার প্রশিক্ষণ একাডেমী থেকে প্রশিক্ষণ লাভ করে যুদ্ধে যোগদান করেন। এ কোর্স-কে প্রথম বাংলাদেশ সর্ট সার্ভিস কোর্স বলা হয়। ৬৭ জন তরুণ মুক্তিযোদ্ধাকে দ্বিতীয় সর্ট সার্ভিস কোর্সে ভর্তি করা হয় এবং তারা ১৯৭২ সনে

কমিশন প্রাপ্ত হন। মুক্তিযুদ্ধে ১৩ জন সামরিক অফিসার যুদ্ধ অবস্থায় শাহাদাত বরণ করেন। ৪৩ জন সামরিক অফিসারকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ২৫ মার্চ এবং তার কয়েকদিনের মধ্যে হত্যা করে।

মুক্তিযুদ্ধে বিমান বাহিনী

ক. পাকিস্তান বিমান বাহিনী ত্যাগ করে আসা বাঙালি অফিসার, ক্যাডেট ও বিমানসেনারা সেপ্টেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত স্থলযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মোট প্রায় ৩৫ জন অফিসার ও ক্যাডেট এবং প্রায় ৫০০ বিমানসেনা পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। এইসব বিমান বাহিনীর সদস্যরা যদিও স্থলযুদ্ধে খুবই বিরোচিত ভুমিকা রাখছিলেন তবুও তাদের মধ্যে একটি স্বাধীন বিমান বাহিনী গঠনের চেতনা খুব প্রবল ভাবে কাজ করছিল। এই চেতনা নিয়েই কিছু সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা পাইলট ভারতীয় বিমান বাহিনী, ভারতীয় সরকার এবং বাংলাদেশ ফোর্সেস (বিডি এফ) এর সাথে বিভিন্ন রকমের আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

খ. কিলো ফ্লাইট : ১৯৭১ এর সেপ্টেম্বর এর মাঝামাঝি ভারত সরকার অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারকে একটি স্বাধীন বিমান বাহিনী গঠনের জন্য আমেরিকায় তৈরি ১টি পুরানো ডিসি-৩ বিমান, কানাডার তৈরি ১টি অটার বিমান এবং ফ্রান্সের তৈরি ১টি এ্যালুয়েট-৩ হেলিকপ্টার দেয়। এর সাথে ভারতের নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে একটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিত্যক্ত রানওয়ে ব্যবহারের অনুমতি দেয়। এই সীমিত সম্পদ নিয়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর যাত্রা শুরু হয়। বিমান বাহিনী প্রধান হিসাবে মুক্তিযুদ্ধের উপ-প্রধান গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকারকে নিয়োগ দেওয়া হয়। সশস্ত্র বিমান বাহিনী গঠনে গোপনীয়তা রক্ষার্থে এর গুপ্ত নাম হয় 'কিলো ফ্লাইট'। 'কিলো ফ্লাইটের' অস্তিত্ব বিডি এফ এবং গোটা কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছাড়া আর কেউ জানতেন না। কিলো ফ্লাইটে বিমান বাহিনীর পাইলটদের পাশাপাশি বেশ কয়েকজন পি আই এ এবং প্লান্ট প্রটেকশনের পাইলট এসে যোগ দেন। বিভিন্ন সেক্টর হতে যুদ্ধরত মোট ৫৮ জন বিমানসেনাকে এই ফ্লাইটে নিয়ে আসা হয়। এই ফ্লাইটের নেতৃত্বের দায়িত্ব দেয়া হয় স্কোঃ লীঃ সুলতান মাহমুদকে। এই সব অত্যুৎসাহী বিমান বাহিনী সদস্যদের সমন্বয়ে ১৯৭১ এর ২৮ সেপ্টেম্বর সশস্ত্র বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর উদ্বোধন হয়। শুরু হয় কঠোর প্রশিক্ষণ। এই ফ্লাইট, ঢাকা, চট্টগ্রাম, লালমনিরহাট এলাকায় মোট ৫০টি অভিযান সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করে। এদের মধ্যে মোগলহাটে (১৫ অক্টোবর ৭১), লালমনিরহাট ও ঠাকুরগাঁয়ে (১৬ অক্টোবর ৭১), চৌগাছায় (২১ নভেম্বর ৭১), গোদনাইল ও পতেঙ্গায় (৩ ডিসেম্বর ৭১), সিলেটে (৪ ডিসেম্বর ৭১), জামালপুরে (৫ ডিসেম্বর ৭১), মেঘনা নদীতে (৬ ডিসেম্বর ৭১), সিলেটে (৭ ডিসেম্বর ৭১) এবং নরসিংদীতে (১১ ডিসেম্বর ৭১) বিমান হামলা বিশেষ

উল্লেখযোগ্য।

মুক্তিযুদ্ধে নৌ-বাহিনী

মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবময় ভূমিকা রয়েছে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অধীনে বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর জন্ম হয়। ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে ঐতিহাসিক সেক্টর কমান্ডারদের কনফারেন্সের ঘোষণা মোতাবেক বাংলাদেশ নৌ বাহিনী আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাঙালি অফিসার ও নাবিকগণ পশ্চিম পাকিস্তান ত্যাগ করে দেশে এসে বাংলাদেশ নৌ বাহিনী গঠন করেন। ভারত থেকে প্রাপ্ত 'পদ্মা' ও 'পলাশ' নামের ছোট দুটি গানবোট এবং ৪৯ জন নাবিক নিয়ে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ নৌ বাহিনী। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এ সমস্ত নাবিকগণ শত্রুর বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধ ও গেরিলা যুদ্ধে লিপ্ত হন। পাশাপাশি ' অপারেশন জ্যাকপট' নামে নির্ভীক ডুবুরীদল সমুদ্র ও নদী বন্দর সমূহে বিধংসী আক্রমণ পরিচালনা করেন। এতে হানাদার বাহিনীর ২৬ টি জাহাজ ধ্বংস হয় ও সমুদ্র পথ কার্যতঃ অচল হয়ে পড়ে। নৌ বাহিনীর অপারেশনের মধ্যে হিরণ পয়েন্টের মাইন আক্রমণ (১০ নভেম্বর ৭১), মার্কিন ও ব্রিটিশ নৌযান ধ্বংস (১২ নভেম্বর ৭১), চালনা বন্দরে নৌ হামলা (২২ নভেম্বর ৭১), চট্টগ্রাম নৌ অভিযান (০৫ ডিসেম্বর ৭১), পাকিস্তান নৌ ঘাঁটি পিএনএস তিতুমীর অভিযান (১০ ডিসেম্বর ৭১) উল্লেখযোগ্য। মহান মুক্তিযুদ্ধে নৌ বাহিনীর দুঃসাহসিক অভিযানে শত্রুপক্ষ নৌ পথে দিশেহারা হয়ে পড়ে। মহান মুক্তিযুদ্ধে বহুসংখ্যক নৌ সদস্য শাহাদৎ বরণ করেন। তাঁদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের স্বীকৃতি স্বরূপ শহীদ রুহুল আমিন, ইআরএ-১, কে বীরশ্রেষ্ঠ খেতাব প্রদান করা হয়। এছাড়া ০৫ জনকে বীর উত্তম, ০৮ জনকে বীর বিক্রম এবং ০৭ জনকে বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত করা হয়। জাতি মহান মুক্তিযুদ্ধে নৌ বাহিনীর ভূমিকাকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

ব্রিগেড সংগঠন ও অপারেশন

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকটা ছিল গেরিলাভিত্তিক কিন্তু এভাবে গেরিলা যুদ্ধ পাকিস্তানি বাহিনীর সুশিক্ষিত সৈন্যদের পদানত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারছিল না। ফলে যুদ্ধ ক্ষেত্রে গতিশীলতা আনয়ন ও মুক্তাঞ্চল গঠনের লক্ষ্যে সেনাবাহিনীর গঠন বিন্যাসের পরিবর্তন আনার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এপ্রিল মাসে মুজিবনগর সরকার গঠিত হলে প্রধান সেনাপতি কর্নেল এম এ জি ওসমানী সেনাবাহিনীর সদস্যদের নিয়ে নিয়মিত ব্রিগেড গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সম্মুখ সমরের পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সংগে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য তিনটি নিয়মিত ব্রিগেড গঠন করা হয়। এরা হচ্ছে :

ক. জেড ফোর্স : লেঃ কর্নেল জিয়াউর রহমানের নামানুসারে জুলাই ৭১ সনের ৭ই জুলাই গঠিত হয় এই বিগ্রেড যার নাম করা হয় জেড ফোর্স। এই ফোর্সের অন্তর্ভূক্ত ছিল ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ৩ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ২ ফিল্ড ব্যাটারি আর্টিলারি ও একটি সিগন্যাল কোম্পানী। জুলাই ৭১ থেকে সেপ্টেম্বর ৭১ পর্যন্ত জেড ফোর্স ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর ও রৌমারী এলাকায় যুদ্ধরত থাকে। অক্টোবর থেকে চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত তারা সিলেট, সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজার এলাকায় যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। জেড ফোর্সের উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ সমূহ ছিল কামালপুর যুদ্ধ, বাহাদুরাবাদ ঘাট অপারেশন, দেওয়ানগঞ্জ থানা আক্রমণ, নকসী বিওপি আক্রমন, চিলমারীর যুদ্ধ, হাজীপাড়ার যুদ্ধ, ছোটখাল, গোয়াইনঘাট, টেংরাটিলা, গোবিন্দগঞ্জ, লামাকাজি, সালুটিকর বিমানবন্দর, ধলই, ধামাই চা বাগান, জকিগঞ্জ, আলি ময়দান, সিলেট এমসি কলেজ, ভানুগাছা, কানাইঘাট, ফুলতলা চা বাগান, বড়লেখা, লাতু, সাগরনাল চা বাগান, ছাতক ও রাধানগর।

খ. কে ফোর্স : লেঃ কর্নেল খালেদ মোশাররফের নামানুসারে সেপ্টেম্বর ৭১ সনে গঠিত হয় এই বিগ্রেড যার নাম করা হয় কে ফোর্স। এই ফোর্সের অন্তর্ভূক্ত ছিল ৪ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ৯ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ১ ফিল্ড ব্যাটারি (মুজিব ব্যাটারী) আর্টিলারি ও একটি সিগন্যাল কোম্পানী। কে ফোর্সের উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ সমূহ ছিল দেউশ মন্দভাগ অভিযান, শালদা নদী অভিযান, পরশুরাম, চিতলিয়া, ফুলগাজী, নিলক্ষ্মীর যুদ্ধ, বিলোনিয়ার যুদ্ধ, চাপিলতার যুদ্ধ, কুমিল্লা শহরের যুদ্ধ, নোয়াখালীর যুদ্ধ, কশবার যুদ্ধ, বারচরগ্রাম যুদ্ধ, মিয়াবাজার যুদ্ধ, গাজীপুর যুদ্ধ, সলিয়াদীঘি যুদ্ধ, ফেনী যুদ্ধ, চট্টগ্রাম বিজয় ও ময়নামতি বিজয়।

গ. এস ফোর্স : লেঃ কর্নেল কে এম সফিউল্লাহর নামানুসারে অক্টোম্বর ৭১ সনে গঠিত হয় এই বিগ্রেড যার নাম করা হয় এস ফোর্স। এই ফোর্সের অন্তর্ভূক্ত ছিল ২ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ১১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, এস ফোর্সের উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ সমূহ ছিল ধর্মগড় আক্রমন, মনোহরদী অবরোধ, কলাছড়া অপারেশন, বামুটিয়া অপারেশন, আশুগঞ্জ অপারেশন, মুকুন্দপুর যুদ্ধ, আখাউড়া যুদ্ধ, ব্রাহ্মণবাড়িয় যুদ্ধ, ভৈরব ও আশুগঞ্জ যুদ্ধ, কিশোরগঞ্জ যুদ্ধ, হরশপুর যুদ্ধ, নরসিংদী যুদ্ধ ও বিলোনিয়ার যুদ্ধ।

বি এল এফ (মুজিব বাহিনী)

বিশাল এই জনযুদ্ধে ছাত্র ও যুবক শ্রেণী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভুমিতে ছাত্র আন্দোলনের অবস্থান ছিল অত্যন্ত দৃঢ়। ৬০ দশকের মাঝামাঝি এই ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে একটি দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের পরিকল্পনায় সংগঠিত হয়ে রাজনৈতিক মতাদর্শের ছাত্রদের সশস্ত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি সমন্বিত করে। নেতৃস্থানীয় প্রায় ১০,০০০ (দশ হাজার) ছাত্রকে এই বিশেষ

প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। সমগ্র বাংলাদেশকে ৪টি রাজনৈতিক যুদ্ধ অঞ্চলে বিভক্ত করে এই সমস্ত ছাত্রদেরকে নিজ নিজ এলাকার ভিত্তিতে অবস্থান নেয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়।

এই ৪টি অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণকারী নেতৃবৃন্দ ছিল :

ক. পূর্ব অঞ্চল জনাব শেখ ফজলুল হক মনি ও জনাব আ স ম আবদুর রব
খ. উত্তর অঞ্চল জনাব সিরাজুল আলম খান ও জনাব মনিরুল ইসলাম
গ. পশ্চিম অঞ্চল জনাব আবদুর রাজ্জাক ও জনাব সৈয়দ আহমদ
ঘ. দক্ষিণ অঞ্চল জনাব তোফায়েল আহমদ ও জনাব কাজী আরেফ আহমেদ

প্রশিক্ষণ শিবিরে কর্মরত ছিলেনঃ জনাব নূরে আলম জিকু, হাসানুল হক ইনু, শরীফ নূরুল আম্বিয়া, আফম মাহবুবুল হক ও মাসুদ আহমেদ রুমীসহ অনেকে। বাংলাদেশ কমুনিষ্ট পার্টির তত্ত্বাবধানে ছাত্র সংগঠন সংগঠিত হয়। এই সশস্ত্র যুব শ্রেণীকে নেতৃত্ব দেন জনাব হারুনুর রশীদ, নূরুল ইসলাম নাহিদ, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমসহ অনেকে। এ ছাড়াও জনাব কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে এলাকা ভিত্তিক গড়ে ওঠা টাংগাইল মুক্তি বাহিনীর নাম উল্লেখ্যযোগ্য।

স্বাধীন বাংলা বেতার

১৯৭১ পাকিস্তান বিমান বাহিনী আক্রমণে তা ধ্বংস করা হয়। এর পর কিছু দিন আগরতলাতে এবং তারপর ২৫ মে ১৯৭১ কলকাতা থেকে সম্প্রচার নিয়মিত শুরু করা হয়। মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার বিশাল অবদান রাখে। চরম পত্র, রণাংগন কথিকা, রক্ত স্বাক্ষর, মুক্তিবাহিনীর জন্য প্রচারিত অনুষ্ঠান অগ্নিশিক্ষা, দেশাত্ত্ববোধক গান ইত্যাদি মুক্তিযোদ্ধা ও বাংলাদেশের মানুষকে উজ্জীবিত করেছিল।

গণমাধ্যম

বিভিন্ন দেশে সংবাদপত্র প্রকাশ করা। এই সব সংবাদপত্রে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা, বাংলাদেশ সরকারের কার্যক্রম ও নির্দেশাবলী, নেত্রবৃন্দের বিবৃতি ও তৎপরতা, প্রবাসী বাঙালিদের আন্দোলনের খবর ইত্যাদি প্রকাশিত হত। এদের মধ্যে মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত জয় বাংলা, বাংলাদেশ, বঙ্গবাণী, স্বদেশ, রণাঙ্গন, স্বাধীন বাংলা, মুক্তিযুদ্ধ, সোনার বাংলা, বিপ্লবী বাংলাদেশ, জন্মভূমি, বাংলারবাণী, নতুন বাংলা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া মার্কিন যুক্তরাজ্য থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশ নিউজ লেটার, বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা, আমেরিকা থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশ নিউজ লেটার, বাংলাদেশ নিউজ বুলেটিন, শিক্ষা উল্লেখযোগ্য। কানাডা থেকে বাংলাদেশ স্ফুলিঙ্গ নামক সংবাদপত্র প্রকাশিত হত।

পাকিস্তানী দখলদার বাহিনী ও তার সহযোগীরা

বাংলাদেশে অবস্থিত পাকিস্তান সেনাবাহিনী একটি দখলদার বাহিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ

হয়। দেশকে শত্রুমুক্ত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার এক সশস্ত্র যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। সমগ্র জাতিকে একত্রিত করে বিদেশী বন্ধু ও সহযোগী রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় ১৬ ডিসেম্বর '৭১ বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়।

বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করার এই সশস্ত্র অধ্যায়ে উল্লেখযোগ্য কিছু রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, সামরিক বেসামরিক কর্মকর্তা, ছাত্র ও যুব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর সহযোগী হয়ে মুক্তিকামী মানুষের উপর জঘন্য এবং পৈশাচিক অত্যাচার ও হত্যাকান্ড চালায়। এই নির্মম ও নিষ্ঠুর অত্যাচারে শহীদ হয় ৩০ লক্ষ নিরীহ নিরাপরাধ শিশু-কিশোরসহ সর্বস্তরের মানুষ। শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয় ২ লক্ষ ৫০ হাজারের অধিক বাংলার নারী। দেশ ছাড়তে বাধ্য হয় প্রায় এক কোটি মানুষ। সকলের একটি মাত্র অপরাধ "তারা ছিল বাঙালি"। পাকিস্তানের সামরিক শাসকের দাম্ভিক উক্তি "আমি মানুষ চাইনা- পূর্ব বাংলার মাটি চাই"। এই পোড়া মাটির নীতিকে সমর্থন দিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি বা সংগঠন এগিয়ে আসে।

শান্তি কমিটি

৪ঠা এপ্রিল '৭১ জনাব নুরুল আমিনের নেতৃত্বে অধ্যাপক গোলাম আযম ও খাজা খয়েরউদ্দীন টিক্কা খানের সাথে সাক্ষাৎ করে সর্বপ্রকার রাজনৈতিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন এবং "নাগরিক কমিটি" গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন। ৬ই এপ্রিল '৭১ অধ্যাপক গোলাম আযম ও হামিদুল হক চৌধুরী টিক্কা খানের সাথে সাক্ষাৎ করে "নাগরিক শান্তি কমিটি" গঠনের প্রস্তাব দেন। ৯ই এপ্রিল '৭১ ঢাকায় ১৪০ সদস্য নিয়ে "নাগরিক শান্তি কমিটি" গঠিত হয়। ১৭ই এপ্রিল '৭১ এই কমিটির নাম পরিবর্তন করে "শান্তি কমিটি" রাখা হয় এবং জেলা ও মহকুমা পর্যায়ে এই কমিটি গঠিত হয়। রাজাকার নির্বাচন, নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ এই কমিটির অন্যতম দায়িত্ব ছিল।

রাজাকার বাহিনী

মে '৭১ মওলানা এ কে এম ইউসুফের নেতৃত্বে ৯৬ জন জামায়াত কর্মী নিয়ে খুলনার আনসার ক্যাম্পে এই বাহিনী গঠিত হয়। তিনি এই বাহিনীর নামকরণ করেন ''রাজাকার বাহিনী''। এই বাহিনীর মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৫০,০০০ (পঞ্চাশ) হাজার। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান সহযোগী হিসাবে এই বাহিনী দায়িত্ব পালন করে। বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলে এই বাহিনীর অত্যাচারের চিহ্ন আজো বিদ্যমান।

আলবদর বাহিনী

১৯৭১ এর আগস্ট মাসে ময়মনসিংহে এই বাহিনী গঠিত হয়। সম্পূর্ণ ধর্মীয় আদর্শের উপর ভিত্তি করে এই বাহিনীর গঠন ও কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বাঙালি

জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী বিশেষ ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে এই বাহিনীকে ব্যবহার করা হয়। এই বাহিনীর কার্যকলাপের মধ্যে বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ড অন্যতম। মিরপুর বধ্যভূমি এই বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের সাক্ষ্য বহন করে।

শরণার্থী

পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বর্বরচিত আক্রমণ ও নির্যাতনের শিকার হয়ে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী ভারতে গমন করেন। ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকায় ১৪১টি শরণার্থী শিবির স্থাপিত করা হয়। এই শিবিরগুলিকে মোট ৯,৮৯৯,৩০৫ বাংলাদেশী আশ্রয় গ্রহণ করেন। পশ্চিম বঙ্গে ৭,৪৯৩,৪৭৪, ত্রিপুরাতে ১,৪১৬,৪৯১, মেঘালয়ে ৬৬৭,৯৮৬, আসামে ৩১২,৭১৩ ও বিহারে ৮৬৪১ সংখ্যক বাংলাদেশী শরণার্থী আশ্রয় গ্রহণ করেন।

বিজয়ের পরিকল্পনা- সম্মিলিত চুড়ান্ত আক্রমণ

অক্টোবর '৭১ মাসের মধ্যে পাকিস্তান সেনাবাহিনী মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে সমস্ত সীমান্ত এলাকা ছেড়ে দিয়ে সেনানিবাস অথবা বড় বড় শহর ভিত্তিক অবস্থান নিতে বাধ্য হয়। এই সময়ের মধ্যে মুক্তিবাহিনী বাংলাদেশের প্রায় ৮০ ভাগ এলাকা মুক্ত করেছিল। নভেম্বর '৭১ এর প্রথম দিকে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্র বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত হয় সম্মিলিত বাহিনী। এই পর্যায়ে বাংলাদেশের সমগ্র যুদ্ধ এলাকাকে ৪ ভাগে বিভক্ত করে এই যৌথ কমান্ডের নেতৃত্বে সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে সমন্বিত করে যুদ্ধ পরিকল্পনা গড়ে তোলা হয়। ৩রা ডিসেম্বর '৭১ পাকিস্তান অতর্কিতভাবে ভারত আক্রমণ করলে যুদ্ধের মোড় পরিবর্তিত হয়। ৬ই ডিসেম্বর '৭১ ভারত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলে মুক্তিবাহিনীর মনোবল বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। এই পর্যায়ে সমন্বিত এক যুদ্ধ পরিকল্পনায় সম্মিলিত বাহিনী প্রচণ্ড বেগে অগ্রসর হয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে।

এই চূড়ান্ত যুদ্ধে ভারতীয় ইষ্টার্ণ কমান্ড অংশ গ্রহণ করে। তাদের সদর দপ্তর ছিল কলকাতাস্থ ফোর্ট উইলিয়ামে এবং অধিনায়ক ছিলেন লেঃ জেনারেল জগজিত সিং অরোরা। এই যুদ্ধে ভারতীয়দের তিনটি কোর (৭ টি ডিভিশন), একটি কমুইনিকেশন জোন, একটি প্যারা বিগ্রেড, ৩টি বিগ্রেড গ্রুপ, ১২টি মিডিয়াম রেজিমেন্ট আর্টিলারী, ৪৮ টি ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী, ১টি আরমার্ড রেজিমেন্ট, ২টি ইন্ডিপেন্ডেন্ট আরমার্ড বিগ্রেড, ৩টি ইঞ্জিনিয়ার বিগ্রেড, ২৯ টি বিএসএফ ব্যাটালিয়ান অংশ গ্রহণ করেন। এই যুদ্ধে ভারতীয়দের শহীদদের সংখ্যা ৬৯ জন অফিসার, ৬০ জন জেসিও ৩ জন এনসিও ও ১২৯০ জন সৈনিক। আহত হন ২১১ জন অফিসার, ১৬০ জন জেসিও, ১১ জন এনসিও এবং ৩৬৭৬ সৈনিক। এছাড়াও যুদ্ধে মিসিং হন ৩ জন জেসিও ও ৫৩ জন সৈনিক।

১৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বহু বুদ্ধিজীবিদের পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের

দোসররা পরিকল্পিত ভাবে হত্যা করে। ১৬ই ডিসেম্বর '৭১ বিকাল ৪টা ৩০ মিনিটে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহ্রাওয়ার্দী উদ্যান) পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ৯৩ হাজার সৈন্য বিনা শর্তে সম্মিলিত বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। এই আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন পূর্বাঞ্চলের সম্মিলিত বাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল জগজিত সিং অরোরা ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় অধিনায়ক লেঃ জেঃ এ কে নিয়াজী। এই আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন মুক্তিবাহিনীর উপ-সেনা প্রধান ও বিমান বাহিনী প্রধান গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার। এই অনুষ্ঠানে মুক্তিবাহিনীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন এস ফোর্স অধিনায়ক লেঃ কর্নেল কে এম সফিউল্লাহ, ২নং সেক্টরের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক মেজর এ টি এম হায়দার এবং টাঙ্গাইল মুক্তি বাহিনীর অধিনায়ক জনাব কাদের সিদ্দিকী। ১৬ ডিসেম্বর '৭১ বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়। প্রতি বছর এই দিনটি ''বিজয় দিবস'' হিসাবে পালিত হয়।

বীর মুক্তিযোদ্ধা

আলহাজ্ব আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক এম.পি.
মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ঐতিহাসিক ১৯ মার্চ। ১৯৭১ সালের এই দিনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে গাজীপুরের (সেই সময়ের জয়দেবপুর) জনগণ সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। মনে পড়ে মার্চের সেই এক অবিস্মরণীয় গণ-অভ্যুত্থানের কথা। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ দুপুরে হঠাৎ এক বেতার ভাষণে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেন। এ কথা শোনামাত্রই সারা দেশের মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। দেশের সর্বত্রই স্লোগান ওঠে 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো', 'পিন্ডি না ঢাকা, ঢাকা-ঢাকা', 'পাঞ্জাব না বাংলা, বাংলা-বাংলা', 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা', 'তুমি কে আমি কে, বাঙালি-বাঙালি'। বঙ্গবন্ধু ঢাকায় পূর্বাণী হোটেলে এক সভায় ইয়াহিয়ার ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং ঢাকায় ২ মার্চ ও সারা বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) ৩ মার্চ হরতাল আহ্বান করেন এবং ৭ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জনসভা আহ্বান করেন। জয়দেবপুরে আমার পরামর্শে ২ মার্চ রাতে তৎকালীন থানা পশুপালন কর্মকর্তা আহম্মেদ ফজলুর রহমানের সরকারি বাসায় মহকুমা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. হাবিব উল্লাহ সর্বদলীয় সভা আহ্বান করেন। সভায় আমাকে (আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক) আহ্বায়ক করে এবং মেশিন টুলস ফ্যাক্টরির শ্রমিকনেতা নজরুল ইসলাম খানকে কোষাধ্যক্ষ করে ১১ সদস্যবিশিষ্ট এক সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। সদস্য হন অধ্যাপক আয়েশ উদ্দিন, মো. নুরুল ইসলাম (ভাওয়ালরত্ন), মো. আবদুস ছাত্তার মিয়া (চৌরাস্তা), থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মরহুম

হজরত আলী মাস্টার (চৌরাস্তা), মো. শহীদ উল্লাহ বাচ্চু (মরহুম), হারুন-অর-রশিদ ভূঁইয়া (মরহুম), শহিদুল ইসলাম পাঠান জিন্নাহ (মরহুম), শেখ আবুল হোসেন (শ্রমিক লীগ), থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাঈদ বকস ভূঁইয়া (মরহুম)। কমিটির হাইকমান্ড (উপদেষ্টা) হন মো. হাবিব উল্লাহ (মরহুম), শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা এম এ মুত্তালিব এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ) নেতা বাবু মনীন্দ্রনাথ গোস্বামী (মরহুম)। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার আগেই আমরা এ কমিটি গঠন করেছিলাম। আমি ১৯৬৬ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে 'স্বাধীন বাংলা নিউক্লিয়াস'-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হই। নিউক্লিয়াসের উদ্দেশ্য ছিল সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশকে স্বাধীন করা, যা মূলত বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ১৯৬২ সালেই ছাত্রলীগের মধ্যে গঠিত হয়েছিল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মধ্যেই সশস্ত্র যুদ্ধ করে বাংলাদেশ স্বাধীন করার জন্য বঙ্গবন্ধুর পরামর্শে বাঙালি সৈন্যদের মধ্যেও নিউক্লিয়াস গঠিত হয়েছিল ১৯৬৪ সালে, যার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট স্বঘোষিত ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের দায়ের করা 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান' মামলায়। স্বাধীন বাংলা নিউক্লিয়াসের সঙ্গে জড়িত থাকার কারণেই বুঝতে পেরেছিলাম যে সশস্ত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার এটাই মাহেন্দ্রক্ষণ। জয়দেবপুরে (গাজীপুরে) সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ৩ মার্চ গাজীপুর স্টেডিয়ামের পশ্চিম পাশের বটতলায় এক সমাবেশ করে পাকিস্তানের পতাকা পুড়িয়ে দেওয়া হয়। আমরা ৭ মার্চ জয়দেবপুর (গাজীপুর) থেকে হাজার হাজার মানুষ ট্রেনে করে এবং শতাধিক ট্রাক ও বাসে কওে মাথায় লাল ফিতা বেঁধে সোহরাওয়ার্দী (তৎকালীন রেসকোর্স) উদ্যানে জনসভায় যোগ দিলাম। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। আজকে ভাবতেও অবাক লাগে, কীভাবে এ জনস্রোত এসে মিশে গিয়েছিল ৭ মার্চের মহাসমুদ্রে। ৭ মার্চ উজ্জীবিত হয়ে আমরা সম্ভবত ১১ মার্চ গাজীপুর সমরাস্ত্র কারখানা (অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি) আক্রমণ করি। গেটে বাধা দিলে আমি হাজার হাজার মানুষের সামনে টেবিলে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেছি মাইকে। পাকিস্তানিদের বুঝতে পারার জন্য ইংরেজিতে বলি I do hereby dismiss Brigadier Karimullah from the directorship of Pakistan Ordnance Factory and do hereby appoint Administrative officer Mr Abdul Qader (বাঙালি) as the director of the ordnance Factory. এ ঘোষণায় কাজ হয়েছিল। পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার পেছনের গেট দিয়ে সালনা হয়ে পালিয়ে ঢাকায় চলে আসে। পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার আর পরবর্তী সময়ে ১৫ এপ্রিলের আগে গাজীপুরে যায়নি। পাকিস্তান সমরাস্ত্র কারখানা ২৭ মার্চ পর্যন্ত আমাদের দখলেই ছিল। সম্ভবত ১৩ মার্চ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জিওসি সাহেবজাদা ইয়াকুব আলী জয়দেবপুর রাজবাড়ি মাঠে হেলিকপ্টারে অবতরণ করতে চেষ্টা করলে শত

শত মানুষ হেলিকপ্টারের প্রতি ইটপাটকেল ও জুতা ছুড়তে শুরু করলে হেলিকপ্টার না নামতে পেরে ফেরত চলে যায়। সেদিন ১৭ মার্চ বুধবার, মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে মানুষের ঢল নেমেছিল ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে। আমাদের নির্বাচনী এলাকার এমএনএ সামসুল হক (পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার সদস্য), হাবিব উল্লাহসহ আমি গিয়েছিলাম বঙ্গবন্ধুকে জয়দেবপুরে দ্বিতীয় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টকে নিরস্ত্র করার সংবাদ দিতে। সন্ধ্যায় আমরা পেছনে দাঁড়িয়ে আছি দেখতে পেয়ে কিছু বলতে চাই কি না বঙ্গবন্ধু জানতে চান। কুর্মিটোলা (ঢাকা) ক্যান্টনমেন্টে অস্ত্রের মজুত কমে গেছে অজুহাতে দ্বিতীয় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টে রক্ষিত অস্ত্র আনার জন্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সিদ্ধান্ত নেওয়ার সংবাদ জানাই। সামসুল হক সাহেবের ইশারায় আমি তরুণ হিসেবে এ অবস্থায় আমাদের কী করণীয় জানতে চাইলে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'তুই একটা আহম্মক, কী শিখেছিস যে আমাকে বলে দিতে হবে?' একটু পায়চারি করে বললেন, 'বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্র করতে দেওয়া যাবে না। রেসিস্ট এ্যাট দ্য কস্ট অব এনিথিং।' নেতার হুকুম পেয়ে গেলাম। ১৯ মার্চ শুক্রবার আকস্মিকভাবে পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার জাহান জেবের নেতৃত্বে পাকিস্তানি রেজিমেন্ট জয়দেবপুরের (গাজীপুর) দ্বিতীয় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টকে নিরস্ত্র করার জন্য পৌঁছে যায়। একজন জেসিও (নায়েব সুবেদার) জয়দেবপুর হাইস্কুলের মুসলিম হোস্টেলের পুকুরে (জকি স্মৃতির প্রাইমারি স্কুলের সামনে) গোসল করার সময় জানান যে ঢাকা থেকে ব্রিগেডিয়ার জাহান জেব চলে এসেছে। খবর পেয়ে দ্রুত আমাদের তখনকার আবাসস্থল মুসলিম হোস্টেলে ফিরে গিয়ে উপস্থিত হাবিবউল্লা ও শহীদউল্লাহ বাচ্চুকে এ সংবাদ জানাই। শহীদউল্লাহ বাচ্চু তখনই রিকশায় চড়ে শিমুলতলীতে, মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি, ডিজেল প্ল্যান্ট ও সমরাস্ত্র কারখানায় শ্রমিকদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে জয়দেবপুরে চলে আসার খবর দিলে এক ঘণ্টার মধ্যেই হাজার শ্রমিক ও সাধারণ মানুষ চারদিক থেকে লাঠিসোঁটা, দা, কাতরা, ছেন, দোনলা বন্দুকসহ জয়দেবপুরে উপস্থিত হয়। সেদিন জয়দেবপুর হাটের দিন ছিল। জয়দেবপুর রেলগেটে মালগাড়ির বগি, রেলের অকেজো রেললাইন, স্লিপারসহ বড় বড় গাছের গুঁড়ি, কাঠ, বাঁশ, ইট ইত্যাদি যে যেভাবে পেরেছে তা দিয়ে এক বিশাল ব্যারিকেড দেওয়া হয়। জয়দেবপুর থেকে চৌরাস্তা পর্যন্ত আরও পাঁচটি ব্যারিকেড দেওয়া হয়, যাতে পাকিস্তানি বাহিনী অস্ত্র নিয়ে ফেরত যেতে না পারে। দ্বিতীয় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড ছিলেন মেজর কে এম সফিউল্লাহ (পরবর্তীকালে প্রধান সেনাপতি)। আমরা যখন ব্যারিকেড দিচ্ছিলাম, তখন টাঙ্গাইল থেকে রেশন নিয়ে একটি কনভয় জয়দেবপুরে আসছিল। সে সময় কনভয়ে থাকা পাঁচজন সৈন্যের চায়নিজ রাইফেল তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়।

মাননীয় মুক্তিযোদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আলহাজ্ব এড. আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক ও মরহুম হাবিল উদ্দিন সিকদার জাতীয় সংসদ নির্বাচন - ১৯৯৬ ইং, গোলাম নবী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় , কালিয়াকৈর , গাজীপুর।

এদিকে রেলগেটের ব্যারিকেড সরানোর জন্য দ্বিতীয় ইস্টবেঙ্গলের রেজিমেন্টকে ব্রিগেডিয়ার জাহান জেব আদেশ দেয়। কৌশল হিসেবে বাঙালি সৈন্যদের সামনে দিয়ে পেছনে পাঞ্জাবি সৈন্যদের অবস্থান নিয়ে মেজর সফিউল্লাহকে জনগণের ওপর গুলিবর্ষণের আদেশ দেয়। বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যরা আমাদের (জনতা) ওপর গুলি না কওে আকাশের দিকে গুলি ছুড়ে সামনে আসতে থাকলে আমরা বর্তমান গাজীপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের ওপর অবস্থান নিয়ে বন্দুক ও চায়নিজ রাইফেল দিয়ে সেনাবাহিনীর ওপর গুলিবর্ষণ শুরু করি। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গুলিতে জয়দেবপুরে শহীদ হন নেয়ামত ও মনু খলিফা, আহত হন ডা. ইউসুফসহ শত শত মানুষ। পাকিস্তানি বাহিনী কারফিউ জারি করে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ শুরু করলে আমাদের প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে। আমরা পিছু হটলে দীর্ঘ সময় চেষ্টা করে ব্যারিকেড পরিষ্কার করে ব্রিগেডিয়ার জাহান জেব চান্দনা চৌরাস্তায় এসে আবার প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়। নামকরা ফুটবল খেলোয়াড় হুরমত এক পাঞ্জাবি সৈন্যকে পেছন দিয়ে আক্রমণ করেন। সে এক পাঞ্জাবী সৈন্যের রাইফেল কেড়ে নেয়। কিন্তু পেছনে আর এক পাঞ্জাবি সৈন্য হুরমতের মাথায় গুলি করলে হুরমত সেখানেই শাহাদত বরণ করেন।

জাতীয় প্রেসক্লাবে গতকাল মুক্তিযোদ্ধাদের ইতিহাস সংরক্ষণ বিষয়ক এক প্যানেল আলোচনায় বক্তব্য রাখেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়কমন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক —মানবকণ্ঠ

বর্তমানে সেই স্থানে চৌরাস্তার মোড়ে 'জাগ্রত চৌরঙ্গী' নামে ভাস্কর্য স্থাপিত হয়েছে। পরদিন বঙ্গবন্ধু আলোচনা চলাকালে পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণে ১৯ মার্চের নিহতের কথা উল্লেখ করলে জেনারেল ইয়াহিয়া খান উল্লেখ করেন যে জয়দেবপুরে জনতা পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর আধুনিক অস্ত্র ও চায়নিজ রাইফেল দিয়ে আক্রমণ করেছে এবং এতে পাকিস্তানি বাহিনীর অনেক সৈন্য আহত হয়েছে।

১৯ মার্চের পর সারা বাংলাদেশে স্লোগান ওঠে, 'জয়দেবপুরের পথ ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো', 'জয়দেবপুরের পথ ধরো, সশস্ত্রযুদ্ধ শুরু করো'। ১৯ মার্চের সশস্ত্রযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক মাইলফলক। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে ১৯ মার্চ জাতীয় জীবনে এক স্মরণীয় দিন। তাই জাতীয়ভাবে এই দিবসটি পালিত হলে মুক্তিযুদ্ধের মূল্যায়ন যথার্থভাবে হবে বলে আমি মনে করি।

বীর মুক্তিযোদ্ধা
এ.বি.এম. রুহুল আমিন হাওলাদার
কো-চেয়ারম্যান, জাতীয় পার্টি

থাকবো না চলে যাব কিন্তু আমাদের নতুন প্রজন্ম যারা মুক্তিযুদ্ধের পতাকা বহন করবে তারা যেন আদর্শ নাগরিক হয়, সুশিক্ষীত হয় এবং তাদের দেশপ্রেম যেন অসাধারণ ও অনন্য হয়। কারন তারা মুক্তযোদ্ধাদের সন্তা। তারা যেন অন্য মানুয়ের সন্তানদের থেকে যেন মাথা উচুঁ করে চলতে পারে এই সমাজ ব্যবস্থায়। সেই চরিত্র নিয়ে তাদেরকে বলিয়ান হতে হবে। হয়তো তাদের চলার পথে কিছু প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হবে, বা হয়েছে, হচ্ছে, তার পরেও তাঁদেরকে মনে রাখতে হবে তারা মুক্তযোদ্ধার সন্তান, যুগ যুগ ধরে যেন মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে মানুষ সম্মান করে, সেই ভাবে নিজেদেরকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, মানুষের কাছে সমাদৃত হতে হবে, সাধারণ মানুষ যেন বলে একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান দেখো সে কত মহান, কত সৎ, কত ত্যাগী, সাধারণ মানুষের জন্য কত ভালোবাসা তার হৃদয়ে, সাধারণ মানষ থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের চরিত্র হবে ব্যতিক্রম। মুক্তিযাদ্ধার সন্তানরা যদি নিজেদের কে আলাদাভাবে দেশপ্রেমিক হিসেবে গড়ে তোলে, নিজেকে পিতার মতো সৎ ও আদর্শবান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে এই সমাজ ব্যবস্থায়, দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে, এবং মুক্তিযুদ্ধেও চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছড়াতে পারে সাধারণ সমাজের মানুষের কাছে, আমাদের ত্যাগ ও আদর্শের স্মৃতি বহমান রাখে তাহলেই আমাদের ত্যাগ আর আদর্শ প্রতিষ্ঠা হবে সাধারণ মানুষের মাঝে। তাহলে আমরা তোমাদের কর্মের মাঝে বেঁচে থাকব, তোমরাই আমাদের পতাকা বহন করবে। আমরা যা চেয়েছিলাম বাংলার মানুষের মাঝে হাসি ফোটাবো বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গড়ব, মানুষ সুখে থাকবে নিরাপদে থাকবে, একটি আধুনিক বাংলাদেশ গড়ে উঠবে, পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশের পতাকা উড়বে মানুষ তাকিয়ে বলবে বাংলাদেশের মানুষ অনেক ভালো, বাংলাদেশ আজ তাদের সমাজ ছাড়িয়ে পৃথিবীর বুকে মাথা উচু করে চলছে, এটাই আমি আশা করি

একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের কাছে।

আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা, আমি রণক্ষেত্র থেকে ফিরে এসেছি, বেঁচে থাকার কথা ছিল না, আমার সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর এম এ জলিল, তার সাথে আমি ২৯ শে ডিসেম্বর যশোর এর কাছাকাছি ঢাকায় আসার পথে বন্দি হতে হয়েছিল, সেদিনটাকে আমার বিশেষভাবে মনে পড়ে, মেজর জলিল সাহেবের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে রণাঙ্গনে সরাসরি ছিলাম, কিন্তু তার পরেও স্বাধীন দেশে বাড়িতে ফিরে আসার পথে এই ধরনের একটা দূর্ঘটনা আমাদের রাজনৈতিক জীবনে এটা স্মরণ করিয়ে দেয় যে রাজনীতি কতটা নির্মম। যাইহোক আমি আশা করি এরকম ঘটনা আর কারো জীবনে যেন না ঘটে, আমরা যারা মুক্তিযোদ্ধারা বেঁচে আছি আমাদের সকলেরই সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার অধিকার আছে, আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা করি।

আমার পরিচয়, আমি এ.বি.এম রুহুল আমিন হাওলাদার, আমি যুদ্ধ করেছি ৯ নম্বর সেক্টরে খুলনা ও খুলনার আশেপাশে, যশোরে, মংলা। আমরা যুদ্ধ শেষে বাড়িতে ফিরে আসি, এরপরে আবার লেখাপড়া শুরু করি, আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিলাম, আমি ১৯৮৯ সালে মুক্তিযোদ্ধা কোটা থেকে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছি, পরবর্তীকালে আমি ১৯৮১ সালে উপমন্ত্রীর হিসেবে জুট ও টেক্সটাইল এর দায়িত্বে ছিলাম। পরে এরশাদ সাহেব যখন দল গঠন করেন আমাকে আহ্বান করেন তিনি, তার সাথে আমার পূর্ব পরিচয় ছিল, তিনি মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন, আমি মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলে ছিলাম, তখন আমি ঢাকা মহানগরের দায়িত্বে ছিলাম, তেজগাঁও দায়িত্বে ছিলাম, ওইখান থেকেই এরশাদ সাহেব আমাকে মনোনীত করেন এবং আমি নির্বাচিত হয়ে আসি। এরপরে এরশাদ সাহেব যখন দল করেন তখন আমি

তার দলে যোগদান করি, তিনি আমাকে বলেছিলেন, তুমি আমার সাথে থাকো। যখন মুক্তিযোদ্ধা সংসদ করতাম উনি তখন প্রধান পৃষ্ঠপোষক, আমার বহু সভায় তিনি গিয়েছেন তিনি খুব ভালো বাংলা বলতেন। তিনি কাছে নিয়ে আদর ও স্নেহ করতেন আমাদেরকে, তার মমত্ববোধ দিয়ে আমাদেরকে বহু দূরে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। স্বাধীনতার পরে যারা বেকার মুক্তিযাদ্ধা ছিলেন, যাদের পারিবারিক অনেক সমস্যা ছিল, তাদের দিকে তিনি তাকিয়ে ছিলেন, বিশেষ করে আমি একথা অবশ্যই বলব, ইতিহাসে একদিন লিখবে, তিনি বলেছিলেন মুকিযোদ্ধা সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সন্তান, মুক্তিযোদ্ধাদের এতোটুকু সম্মান দেওয়ায় তার ডাকে আমার সাড়া দেওয়া কর্তব্য ছিল। তাই আমি তার দলে যোগ দিয়েছিলাম। সংসদ সদস্য হয়েছিলাম তার দল থেকে। প্রতিমন্ত্রী ছিলাম, মন্ত্রী ছিলাম, তার উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য থেকে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলাম, এবং তার দলের মহাসচিব হিসেবে আমি ১৮ বছর দায়িত্ব পালন করেছি। আজকে আমি জাতীয় পার্টির কো-চেয়ারম্যান। এই দলের ঊষালগ্ন থেকেই আমি দলে আছি এবং সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আমি এই দল করে যাচ্ছি। দেশের মানুষের যে ভালোবাসা এবং সমর্থন আমি পেয়েছি তার জন্য আমি এই দেশের মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ। আমি হয়তো অনেক কিছু দিতে পারি নাই আমার ক্ষুদ্র অবস্থা থেকে, কিন্তু আমি মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি, মানুষের দোয়া পেয়েছি, মানুষের সমর্থন পেয়েছি এবং মানুষের হৃদয়ে ভালোবাসার যে একটা উচ্ছ্বাস সমাজ ব্যবস্থায় থাকে তাও আমি পেয়েছি আমি বুঝতে পারি যে মানুষ আমাকে ভালবাসে। আমি সেই ভাবে চলার চেষ্টা করেছি যে মুক্তিযোদ্ধা হবেন একজন সমাজের আদর্শ, সমাজের বিবেক, সেই অবস্থানে থেকেই আমি নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছি, আমি দেশের মানুষের সহযোগিতায় এবং তাদের দোয়ায় আল্লাহর অশেষ রহমতে আমি অনেক সম্মান নিয়ে বেঁচে আছি।

১৯৭১ সালে দেশের একটি ক্লান্তিলগ্নে, বঙ্গবন্ধু তখন কারাগারে, ২৬ শে মার্চ অর্থাৎ ২৫ শে মার্চ দিবাগত রাত্রে পাক-হানাদার বাহিনী আমাদের বাঙালি জাতির ঠিকানা আমাদের দেশের ক্যাপিটাল ঢাকা, সেই ঢাকার উপরে অতর্কিতভাবে তারা ঝাঁপিয়ে পরলো, যেখানে দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ থাকেন, বুদ্ধিজীবীরা থাকেন, ছাত্রজনতা শ্রমিক যেখানে সবথেকে বেশি বসবাস করেন এই গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় তারা গভীর রাতে অপারেশন সার্চলাইট নামে হত্যাযজ্ঞ চালালো, রাজারবাগের বাঙালি পুলিশদের হত্যা করল। রোকেয়া হল, শামসুন্নাহার হলে আক্রমন করে হত্যা যজ্ঞ চালালো, যখন যেভাবে মানুষগুলো পেয়েছে তখন তাদেরকে গণহত্যা করল নির্বিচারে।

পরেরদিন দেশের মানুষের ভিতরে একটা অনিশ্চয়তা দেখা দিল, অস্বাভাবিক পরিস্থিতি দেখা দিল, আমরা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আন্দোলনে ছিলাম, সংগ্রামে ছিলাম, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা আন্দোলন-সংগ্রাম করছিলাম তাই সেই ২৫ মার্চ রাত্রে তাকেও ওরা এরেস্ট করলো। আমরা ছাত্র-জনতা যে যেখানে আশ্রয় নিতে পারি সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। তারপরে আমরা অনুসরণ করলাম বঙ্গবন্ধুর ভাষণ। "তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করো, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" এই কথাগুলো আমাদের হৃদয়ে গোচ্ছিত ছিল, আমরা অনেক সাহস নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম, এরপরে শুরু হল ঢাকার বাহিরে অপারেশন, আমি তখন বরিশালে, আমরা দেখলাম এপ্রিল মাসে, সম্ভবত ২৩শে এপ্রিল শুক্রবার বরিশাল আক্রমণ করল, হানাদার বাহিনী বরিশাল দখল করল, সেখানে কিছু কিছু জায়গায় আমাদের সাথে গোলাগুলি হলো, আমাদের ছাত্রবন্ধুরা এবং পুলিশের লোক এরা ঘুরে দাঁড়ালো কিন্তু ওদের সশস্ত্র আক্রমণ আমাদের পিছু হাটতে বাধ্য করলো। তারপরে ২৫ এপ্লিল তারিখে তারা পটুয়াখালী দখল করল। হেলিকপ্টারে করে সেখানে সৈন্য নামালো, অনেক লোককে মেরে ফেলল এবং অফিস-আদালত দখল করল। এরপরে কিছু দিন কাটলো আমরা সবাই মিলে কিভাবে এই শত্রুর মোকাবেলা করবো এই ভেবে আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে থাকলাম, এবং আমাদের কাছে কিছু অস্ত্র ছিল। আমাদের আমাদের সিনিয়র যারা সহকর্মী এবং পুলিশ বাহিনী (ইপিআর) থেকে যারা চলে আসলো এবং যারা সেনাবাহিনীতে ছিল তারা গ্রামে চলে এসে গ্রামের যুবক এবং উল্লেখযোগ্য লোকদেরকে নিয়ে ২০০ লোক কে তারা একত্রিত করল এবং দশটা রাইফেল দিয়ে ট্রেনিং দেয়া শুরু করল। এর মধ্যে আমাদের কলসকাঠি, বাকেরগঞ্জে বারোটা জমিদার পরিবার ছিল, সেইখানে হিন্দুদের উপর অতর্কিত আক্রমন করল, ভোর রাত্রে গানবোট নিয়ে ঘেরাও করে

ফেলল, একই দিনে প্রায় তিনশো লোককে ওরা নির্মমভাবে হত্যা করলো, কলস কাঠির পাশ দিয়ে একটা ছোট্ট নদী তার পানি রক্তে লাল হয়ে গেল, এবং প্রত্যেকটা লাশ নদীতে ফেলে দিল, নদীর পাড়েই আমাদের বাড়ি, অদূরেই পায়রা নদী, রাতে আমরা গোলাগুলি শুনলাম এবং সকালে দেখলাম মৃতদেহ গুলো নদীতে ভেসে যাচ্ছে।

আমরা তখনই সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা আমাদের জীবন বাজি রেখে এই মাতৃভূমিতে রক্ষা করবো, মুক্ত করবো আমাদেও দেশ, তখন আমরা ছোটাছুটি শুরু করলাম কোথায় অস্ত্র আছে, কোথায় আমরা একত্রিত হব, এইভাবে আমাদের ইউনিয়নে, আমাদের উপজেলায়, সমস্ত জায়গায় বঙ্গবন্ধুর কথামতো গ্রামে গ্রামে সমস্ত জায়গায় আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে কমিটি গঠন করে সংগঠিত হতে লাগলাম। এরপরে আমি শুনলাম আমার দুই ভাই যারা আওয়ামীলীগ করত, তাদেরকে ধরে নিয়ে হত্যা করেছে, তাদের ডেড বডিও পাওয়া যায়নি, সেখানে যে যাব, সে পরিবেশও নেই, এবার আমরা বাড়ি থেকে বের হলাম, বের হয়ে বাকেরগঞ্জ, বাকেরগঞ্জ থেকে দবদবিয়া নামক একটি জায়গায় রাত্রিযাপন করলাম, সেখান থেকে আমরা গেলাম বাবুগঞ্জ, বাবুগঞ্জে এসে একটা যুদ্ধ হয়ে গেল, আমাদের ছাত্র যুবক ভাইয়েরা এবং সেনাবাহিনীর কিছু লোকের নেতৃত্বে থানা লুট করে দখল করে নিলাম, মজিদ খান, কুদ্দুস মোল্লা সহ আরো কয়েকজন সাহসী লোক ছিল। আমরা ওখানে রাত্রে একত্রিত হয়ে দেখলাম যে এখানে যে পরিমাণ অস্ত্র আছে, তাতে আমরা সকলে যারা ছাত্র বা যুবক আছি, তাদের হাতে অস্ত্র পৌঁছাতে দেরি হবে, আমরা এখনো ট্রেনিং নিতে পারি নাই তাই ট্রেনিং নেবার জন্য আমরা আস্তে আস্তে ভারতের পথে রওনা হলাম। উজিরপুরে পয়সারহাট নামক একটা জায়গা আছে সেখানে হয়ে আমরা মধুমতি নদী দিয়ে গোপালগঞ্জ হয়ে মাগুরা ও যশোরের মাঝে আড়পাড়া ব্রিজের নিচ দিয়ে, অনেক কষ্ট করে পার হলাম। উপরে রাজাকার ও মিলিশিয়া পুলিশ ডিউটি করে, তারা দেখামাত্র গুলি করে যুবকদের, তখন মে মাস হবে হয়তো, বৃষ্টি এসে গেছে। আমরা তখন পার হয়ে যাচ্ছি তখন গুলি হলো। আমাদের সাথের অনেক গুলো লোক মারা পরলো। তারপরও আস্থা হারাইনি, বাড়িতে ফেরার আর কোনো সুযোগ নাই। আমরা অনেক দূরে এগিয়ে এসেছি। বিভিন্ন জায়গায় পাক হানাদার বাহিনী তারা পজিশন নিয়ে আছে। আমরা সামনে যাবো, মৃত্যু হলে রাস্তায় হয়ে যাক, কিন্তু ভারতে যাব ট্রেনিং নেবো। তারপর রাএে আমরা কালীগঞ্জ থানা অতিক্রম করলাম। ওখানে বাগদা বর্ডার নাম করে একটা জায়গা আছে সেখানে ফায়ার হলো। আমাদের, ভারতের সৈনিকেরা তারাও অস্ত্র নিয়েছিলো। এবং মেজর জলিল ঐ অঞ্চলের মধ্যে পরলো। যশোরের কিছু অংশ পরেছিলো খুলনার, ওইখানে তারা মটার দিয়ে ফায়ার করলো। দুই পাশেই গোলাগুলি হচ্ছে কিন্তু আমরা নিচ দিয়ে

নৌকায় পার হয়ে বাগদা বর্ডার অতিক্রম করলাম। ওখানে বনগাঁয়ে একটা জায়গা আছে, সাব ডিভিশন হয়ে, সেখানে যাওয়ার পরে সেখানে আমাদেও ইউথ রিসিভিং ক্যাম্প ভারতের, সেখানে গিয়ে আমরা রের্কড করলাম সেখানে আমাদের মন্নান সাব ছিলো, তিনি আমাদের আপনজন। তার বাড়ির কাছেই আমার বাড়ি। ৭০ সনের নির্বাচনে আমরা তার ভোট করেছি।

ওইযে আমরা তার ভোট করেছি, এটা তার মনে আছে। সে তখন এমপি। সে থিয়েটা রোডে ক্যালকাটায় অবস্থান করছেন। বাংলাদেশের কিছু অফিস মুক্তিযুদ্দের জন্য ওখানে করা হয়েছিল। আমরা ওখানে গিয়ে আমাদের নেতৃবৃন্দের সাথে দেখা করলাম। বিশেষ করে মন্নান সাবের সাথে যখন দেখা হলো, আরো অনেক কথা কিভাবে দেখা হলো, অনেক ঝুঁকি ছিলো। যাওয়ার পরেই মন্নান সাব একটা চিঠি লিখে দিলো।পলতা ক্যাম্প, ওটা হলো বনগাঁয়ে। বনগাঁ থেকে অদূরেই, আমরা সেখানেই গেলাম। ঐ চিঠি অনুসারে ঐদিন রা ট্রেনিং হলো। পথেও আমরা কিছু দুর্ঘনার সম্মুখীন হইলাম। যাইহোক বেঁচে থাকাই ছিলো একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। আমরা যখন বিহার, আগে ছিল ঝাড়খান প্রদেশ, সেকানে গিয়ে পৌঁছলাম। ঐ ঝাড়খানই এখন ক্যান্টনমেন্ট। ওখানে যাওয়ার পরেই সন্ধা হলো, ওখানে ৩১ টা ত্বপোধ্বনি দিয়ে আমাদের কে রিসিভ করলো। ওখানে আর্মির ট্রেন ছিলো ভিন্ন, সেই ট্রেনে করে আমাদের নিয়ে গেলো। রিসিভ করলো আর্মি, তখন আমরা বুঝলাম আমাদের সম্মান জানিয়েছে এবং আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে এইভাবে। ডিফেন্সের রুলস অনুসারে আমাদের তারা সেইভাবেই নিচ্ছে। তো সাহস ও আস্থা আরো বেড়ে গেলো। আমরা তারপরে ৬ নম্বর উইংয়ে গেলোম। সেখানে আমাদের ট্রেনিং শুরু হলো, জাহাজ কিভাবে উড়াইতে হবে ফ্লোটিং মাইন দিয়ে, এক্সপ্লোসিভ দিয়ে ব্রীজ উড়িয়ে দেওয়া, শত্রুর সাথে যুদ্ধ করা।

ওখানে হায়ার ট্রেনিং হলো, তিন মাসের, সেই ট্রেনিং নিয়ে আমরা মেজর জলিল ছিলো বাগুন্ডিয়া ঐখানে আমরা আসলাম। আসার পরে, ওখান থেকে আমাদের অস্ত্র দিলো,সব দিয়ে দিলো। আমরা ভিতরে ঢুকলাম, রাস্তায় আমাদের কয়েক জায়গায় শত্রুর সাথে মোকাবেলা করতে হয়েছে এবং আমরা সেখানে সফলতার সাথে সুন্দর বন এসে পৌছলাম। সুন্দরবনে ওখানে একটা বাজুয়া বাজার ছিলো, সেই বাজারে আমরা ক্যাম্প করলাম। ওখানে বঙ্গবন্ধুর একজন আত্মীয় ছিলো, সম্পর্কে চাচা। সে-ই আমাদের ইউনিটের নেতৃত্ব দিচ্ছিলো। বঙ্গবন্ধুর রক্তে জরিত,আমাদের একটা আস্থা আসলো। তার নাম ছিলো শেখ ফরিদ, বঙ্গবন্ধুর মতোই চেহারা ছিলো, গোফ, চুল সব কিছুই বঙ্গবন্ধুর মতো দেখতে। মনে হলো জুনিয়র বঙ্গবন্ধু, আমরা খুবই উৎসাহী। ক্যাম্পের কমান্ডার হিসেবে অফিসিয়াল দায়ীত্বে ছিলেন মিজানুর রহমান বাচ্চা তার বাড়ি নারায়নগঞ্জে ওখানে বসেই

অপারেশন হলো অনেক। অপারেশন গুলো শেষ করে যখন খুব কাছাকাছি এসে গেলাম, আমরা খুলনার পথে এগোতে থাকলাম, এবং ফুল বাড়িয়াতে একটা জায়গা আছে স্বাধীনতার পরে দেখা গেছে ঐখানে গাছগুলো ঝাঝড়া হয়ে গেছে, ওদের গুলিতে। যাইহোক আমরা শহরে প্রবেশ করে গেলাম। এটা ইতিহাসের কথা, ঢাকা যখন মুক্ত হলো ১৬ ডিসেম্বর, ওরা আত্মসমর্পন করলো কিন্তু খুলনা মুক্ত হতে ১৭,১৮ তারিখ লাগলো। তারপর দুইদিন যুদ্ধ হলো, আমাদের অনেক গুলো বাহিনী আশেপাশে যে থানা গুলি ছিলো, সেখান থেকে মুক্তিযোদ্ধারা এসে ঘিরে ফেললাম খুলনাকে। আমাদের যেখানে যে রেইঞ্জ দিয়েছে, ভাগ ভাগ করে দিয়েছে। এইখানে এই ইউনিট বা রেইঞ্জ থাকবে। আমাদের সাথে মিএ বাহিনী ও প্রবেশ করলো, ওরা যখন আত্মসমর্পণ করলো, তখন অনেক অস্ত্র গোলাবারুদ আমাদের আয়ত্বে আসলো। সেই অস্ত্রগুলো নিয়েও পরে অনেক কথাবার্তা হয়েছে। পরে মেজর জলিল এসে পৌছলেন। আসার পরে আমরা খুলনা দখল নিলাম। আমাদের ক্যাম্পটা ছিলো পোলট্রি ক্যাম্প খালিশপুরে। সুলতান সাহেব ছিলেন ক্যাপ্টেন, আমাদের ইউনিটের চার্জে ছিলেন তিনি। ওখানে ৮০০/৯০০ শত মুক্তিযোদ্ধা ছিলো। পরে আমরা জলিল ভাইয়ের সাথে দেখা করলাম। আমার দুইটা ভাইকে যে মেরে ফেললো, আপন বড় চাচার ছেলে, মেঝো চাচার ছেলে। এই কারনে আমার চাচাও ওখানে হার্টফেল করেলো। ওখানে একটা কবর স্থান আছে টুটপাড়ায়, ঐ কবর স্থানে আমার চাচাকে দাফন করা হয়। আমরা শুনলাম, দেখতে পেলাম না, কারন তখন তো আমি যুদ্ধে। ভাইদের লাশও পেলাম না। কিছু লোক ধরলাম সন্দেহ করে, তারা বললো তারা বিহারি। পরে দেশ স্বাধীন হলো, তাদেরকে মেরে ফেলাও যাচ্ছে না, জলিল ভাইয়ের কাছে গেলাম, সে বললো, আইন তোমরা নিজের হাতে তুলে নিওনা। এইভাবে আমরা একটা সময় অতিক্রম করেছি, তবে যুদ্ধ কালীন সময়ে দিন কিভাবে গেলো, রাত কিভাবে গেলো টের পেলাম না। আর মৃত্যুর কথাও ভাবতাম না, ভাবতে পারিনি। ভারতে যখন যাই, পয়সার হাটে একটা পোষ্ট অফিস দেখতে পেলাম। চিঠি লিখে গেলাম মায়ের কাছে যে, মা আমি ভালো আছি। দোয়া করবেন আমি যেনো দেশকে মুক্ত করে আবার আপনাদের কাছে আসতে পারি। এই চিঠি যুদ্ধের পরে যখন বাড়িতে আসি, তখন দেখি চিঠিটা পৌঁছেছে অনেক পরে। আমাদের স্মৃতি বেশি বেদনাদায়ক, আমার বন্ধু মারা গেলো,তাকে আমরা কাঁধে করে নিয়ে শুয়ে দিলাম।

অনেক ঘটনা ঘটেছে কিন্তু এতো নির্মমতা, আত্মরক্ষা করা,আমি ও হয়তো মারা যাবো এই রকম অবস্থা, বর্ষার মতো গুলি হতো, যে বাঁচছে সে-তো ভাগ্যের জোরে বাঁচছে।সম্মখ যুদ্ধ অনেক কঠিন। আর আমরা গেরিলা ছিলাম হিট এন্ড রান। অনেক সময় শত্রুর সামনা-সামনি হতে হয়েছে। কিন্তু হিট এন্ড রান টা

ছিলো, আমরা একটা পজিশন নিয়ে থাকবো, আমাদেরকে শত্রু যেন আক্রমন করতে না পারে কিন্তু আমরা যেন তাদেরকে আক্রমণ করতে পারবো এবং আক্রমণ করে আমরা পালাইয়া যাবো। এটা হলো গেরিলা। একটা ব্রীজ উড়াইয়া দিতে হবে। আমরা গেলাম এক্সপ্লোসিভ দিয়ে একটা ডেন্টানেটর দিয়ে ব্রীজটা উড়িয়ে দিলাম। ফলে পাক আর্মিরা ঐ এলাকায় আর ঢুকতে পারলোনা। খুলনা এলাকার কথা বলছি যে, আমাদের যশোর, খুলনা, মোংলা, বাগেরহাট এসব অঞ্চলে পাক-হানাদার বাহিনীর যোগাযোগ বিছিন্ন হয়ে গেলো। আমাদের সহযোদ্ধা, সহকর্মীরা যারা ছিলো তারা প্রত্যেকেই ঐ ট্রেনিংও ছিলো। প্রত্যেকই এটা করার পর সংকুচিত হয়ে আসলো।

পরে আমার মনে আছে ৮ নভেম্বর অপারেশন, এই অপারেশনটা খুব ভয়াবহ হয়েছিল। খুলনা,বরিশাল এবং চিটাগাংয়ে যতো ওদের গানবোট ছিলো সব আক্রমন করা হলো। এবং বিশেষ করে নেবি, গেরিলা এবং ভারতের হাই অফিসার্স যৌথ অপারেশন ছিলো। যখন আক্রমন হয় তখন আমরা মোংলায়। তো এই যুদ্ধটা ভয়াবহ ছিলো, কিন্তু এটা সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল জানতোনা, বা ওসমানী সাহেব জানতোনা। এটা ভারতের রন কৌশল আর আমাদের যোদ্ধাদের সমন্বয় বিশেষ করে নেভির যারা প্রশিক্ষন প্রাপ্ত অফিসার খুলনার গানবোট গুলো মোংলার ওখানে আক্রমন করে,

মোংলার ওখানে আক্রমন হলো, বিদেশি মালামাল নিয়ে এসেছে কার্গো জাহাজ, ঐখানে দেখলাম দুই পক্ষের সৈন্যের মাঝে গোলাগুলি চলছে, ভারতের সৈন্যের সাথে আর পাক আর্মি সাথে। আমরা এইপাড়ে, ওরা এপারে আসলে আমরা স্বাভাবিক ভাবেই ধরে ফেলবো। কিন্তু এর মধ্যে আমরাই মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে গেলাম। ভারতীয় জাহাজ গুলো, বোমারু বিমান গুলো একের পর একটা আক্রমন করলো, পাকিস্তানি কিছু ছিলো, দুই পক্ষের যুদ্ধে পাকিস্তানি পরাজিত হয়ে গেলো। আমাদের ঐখানে ও কিছু লোক আত্মঘাতী মূলক কাজ হয়েছে, মিএ বাহিনী বুঝতে পারেনি তারা আমাদের সৈনিকের উপর গুলি করেছে। যারা নদীতে ছিলো, জাহাজ ডুবে গেলো কিছু লোক সাতাঁর কেটে উপরে উঠলো। তারপর কয়েকজনকে বন্ধি করলো, টর্চার করলো স্থানীয় রাজাকাররা। যখন ভারত আক্রমন করলো, তখন পাক আর্মি বুঝতে পারলো যে, তাদের কে পরাজিত হতে হবে। আস্তে আস্তে তারা দুর্বল হয়ে আসলো এবং ক্লোজ হইতে ছিলো। আমাদের আশেপাশে যে ঘাঁটি গুলো ছিলো তারা সব ক্লোজ করে খুলনায় চলে গেলো। আমরা ও বুঝলাম তারা নাই এখন আমাদের আগাতে হবে। সবচেয়ে বড় যুদ্ধ হলো নেভিরটা। খুলনা যখন আমরা দখল করলাম, তখন তারা বাঁধা দিয়েছিলো, কিন্তু তারা পারেনি। তারা কোথাও আশ্রায় পায়নি, সব বাঙালী এক হয়ে গিয়েছিল।ততোক্ষণে আমাদেও এডভান্স পার্টি

খুলনায় ঢুকে গেল, যারা স্থানীয় ছিলো তারাও খুলনায় ঢুকে গেলো, আমি কভারিং পার্টিতে ছিলাম, আমাদের পিছনে আর্টিলারী ছিলো, জলিল ভাই ছিলো, এইভাবে একটা ভয়াবহ সময় কেটে গেলো। যেটা স্বাধীন হওয়ার পরেও আমরা কিছু দিন, মানে স্বাধীনতার যে বিজয়, সেই বিজয় পতাকাটাকে যে কিভাবে অনুভব করবো,সেটা আমরা পারিনি। আমরা মনে করলাম এখনও বুঝি যুদ্ধ চলছে, আমরা যুদ্ধ করবো।

১০ ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু যখন দেশে আসলো, এর আগে মেজর জলিলের সাথে একটা ভুল বোঝাবুঝি হইলো তার সাথে আমরা ১৫ জন ছিলাম। আমরা যখন খুলনা থেকে একত্র হয়ে আসতেছি- মিজানুর রহমান বাচ্চু ভাই, মোসলেউদদিন, আমাদের বরিশালের মস্তফা, তারপরে আমাদের গেরিলা আলম ছিলো (বিচ্ছু) আলম গৌরনদীর ছিল। আমরা আসতেছি, আমাদের ক'টা মাইক্রোবাস আর জলিল ভাইয়ের গাড়ি। আমাদের পথ রোধ করলো, এবং আমাদের হোল্ড করালো। ওখানে গোলাগুলি হলে আমরা ও মারা যেতাম, ওরাও মারা যেতো এই রকম একটা পরিবেশ। ওরা পজিশন নিয়েছিলো রাস্তায়। এটা জেনারেল মনজুর বাহিনী, ততক্ষণে মনজু যশোরে চলে আসছে। মনজু কিন্তু জয়েন্ট করেছে নভেম্বরে উনি পালিয়ে আসলো পাকিস্তান থেকে। উনি যশোরে এই সেক্টরে অধিনায়ক হলো, এখান থেকে অর্ডার ছিলো। মেজর জলিল কিছু কিছু বিষয় অপছন্দ করেছিলো এবং উনি ন্যায়ের পথে সত্যের পথে এবং দেশ প্রেমিক একজন সেনা নায়ক হিসাবে তিনি তার চরিত্র টা, তার কথা তার কর্মকান্ডে ফুটে উঠেছিল। প্রতিপক্ষ ওনাকে ভুল বুঝলো। পরে আমরা বের করলাম যে আমাদের অপরাধ কি? তখন আমার কাছে এসেলার যখন যশোর সার্কিট হাউসে নিয়ে যায় তখনও আমার কাছে এসেলার ছিলো। তারপর আমাদের অস্ত্র নিয়ে গেলো,রিসিভ দিয়েছিলো। সবাইকে নিয়ে ডিজআর্ম করলো, পওে ওখানে বন্ধি করলো। যশোরে আমরা বন্দি অবস্থায় থাকলাম ইনটারগেশন ফেস করলাম। মেজর হুদা ছিল সেখানে যে পরে খালেদ মোশারেফের সাথে ৭

নভেম্বরের কু তে মারা যায়।আমরা বন্ধি অবসআথায় থাকা কালিন আমাদের খোজ খবর নিয়েছে আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে নাই। এটা একটা পলিটিকাল সিদ্ধান্ত ছিল। আমরা সেখানে ভিকটিম হয়ে ছিলাম। দেশ স্বাধীন বঙ্গবন্ধু ফিরে আসার পরে তিনি আমাদের মুক্ত করে দিলেন। সম্ভবত ২ জানুয়ারী মেজর জলিল কে নিয়ে আসলো তারা ক্যান্টনমেন্টে আর আমাদের কে রেখেছিল সার্কিটহাউজে। ক্যাপ্টেন সুলতান, মোস্তফা ভাই, বিচ্ছু আলম, মিজানুর রহমান বাচ্চু ভাই, আমরা বাকিরা ছিলাম সার্কিটহাউজে। আমার মনে হলো যে আমরা মুক্ত হলাম কিন্তু আমরা মায়ের কাছে যেতে পারবো কি না জানিনা, এমন একটা প্রশ্ন আমাদের মনে আসলো যে, দেশ স্বাধনি হলো কিন্তু আমরা ভিক্টিমাইজ হলাম কেন? এর পিছনে কি আছে? পরে আমরা কারন গুলো জানতে পারলাম। যাইহোক পর্যায়ক্রমে আমাদেরকে ছেড়ে দিল এবং আসার সময় আসার খরচ বাবদ কিছু টাকাও দিয়ে দিল। আমরা রকেটে বরিশাল চলে আসলাম। আর অনেকে ঢাকা গেলেন। এই ঘটনাটা ছিল দেশ স্বাধীন হবার পরেও আমাদেও জীবনের উপর এটা অনাকাঙ্খিত ঘটনা। সে সময় আমারা যে পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছি তা আমাদের হৃদয় পটে মাঝে মাঝে স্বরন হয়।

বীর মুক্তিযোদ্ধা
মিজানুর রহমান বাচ্চু
(যুদ্ধকালীন গ্রুপ কমান্ডার, ৯ নং সেক্টর)
সিনিয়র সহ সভাপতি, নারায়নগঞ্জ জেলা আওয়ামীলীগ

আজ ও জানতে পারলাম না কেনো সেই ১ মাস আমাদের কারাগারে বন্দি করে রেখেছিল :

যুদ্ধ বিজয়ের পরে বাড়ি যাওয়ার পালা, আমি আগে বলেছি ১৬ ডিসেম্বর সারা দিন একাট উৎসবের দিন ছিল, ১৭ তারিখ সারাদিন যাওয়ার পরে রাত্রে আটটা সাড়ে আটটার দিকে খুলনা থেকে আমাকে মেসেজ করা হলো, ক্যাম্পের যিনি ইনচার্জ ছিলেন ক্যাপ্টেন সুলতান সাহেব উনি আমাকে বললেন বাচ্চু তোমর সাথে ঢাকার যে কয়জন আছে তাদের কে নিয়ে তুমি সকালেই রওনা দেও, খুলনাতে চলে আসো। আমি ওনাকে বললাম যে ক্যাম্পের চার্জ কাকে দিব উনি বললেন আপাতত তুমি টুআইসিকে দিয়ে এসো পরে আমরা ব্যাবস্থা নিব। টুআইসি রফিক সাহেবকে ডাকলাম, ডেকে বল্লাম, আমাকে তো চলে যেতে হচ্ছে, সকালে আমি চলে যাবো, তো আমার যারা মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়েরা আছে সবাইকে একটু খবর দেন। সবাইকে খবর দেয়া হলো সকলে সামনে আসলো, আমি সবাইকে বল্লাম অনেক দিন তোমাদের সাথে ছিলাম তোমাদের সাথে একটা আত্মীয়তার মতো সম্পর্ক হয়ে গিয়েছে, আমি তোমাদের কে আমার মায়ের পেটের আপন ভাইয়ের মতো দেখেছি তার মাঝেও অবস্থার প্রেক্ষিতে কারো সাথে খারাপ ব্যবহার করে থাকতে পারি, আজকে আমরা যুদ্ধে জয়ী হয়েছি আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি একটা বিরাট জয় নিয়ে আমারা যার যার বাড়িতে ফিরে যাব, আমরা এক এক জন এক এক যায়গা থেকে এসে এক মনা হয়ে এক পরিবার হয়ে লড়েছি, একে অপরের দুঃখ ভাগ করে নিয়েছি এর পরেও যদি কেউ আমার ব্যবহারে কষ্ট পেয়ে থাকো তবে আমাকে বড় ভাই হিসেবে ক্ষমা কর দিও। আমি খেয়াল করলাম যে মুক্তিযোদ্ধা যারা আমার সামনে ছিল তাদের অনেকের চোখ পানিতে ছল ছল করছে। আমি তাদের কে বললাম বেচেঁ যদি থাকি আমি তোমাদের সাথে

যোগাযোগ করার চেষ্টা করবো তোমরাও যদি পারো কোন ব্যাপারে প্রয়োজন হলে যোগাযোগ করো।

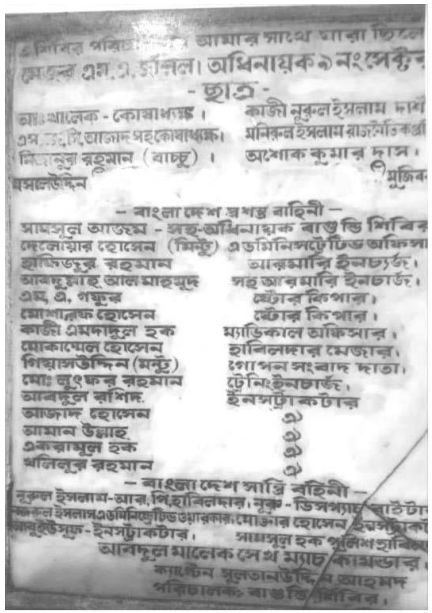

বাগুন্ডি শিবির স্মৃতি ফলক

১৭ তারিখ সকালে আমি বাজুয়া ক্যাম্প থেকে খুলনার উদ্যেশ্যে রওনা হলাম। রাত্রে নৌকা একটা ঠিক করা ছিল, ফজরের আজানের পর পর আমরা রওনা হলাম, আমার সাথে আমার নারায়নগঞ্জের ছাত্র নেতা মনিরুল ইসলামের ছোট ভাই যে এখন এমেরিকা প্রবাশি প্রকৌশলী আব্দুর রব খোকা তাকে নিলাম ক্যাপ্টেন সুলতান উদ্দিন সাহেবের ছোট ভাই সালাউদ্দিন আহমেদ চুন্নু তাকে সাথে নিলাম, খুলনার শাহনেওয়াজ জামান আজাদ আমি আগে ওনার পরিচয়টা দিয়েছি উনি কমার্স কলেজের ভিপি ছিলেন তার ছোট ভাই শাহ আলম চৌধুরী মিরাজ তাকে সাথে নিলাম, ইউসুফ আমাকে বললো স্যার আপনাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাবনা, আমি বললাম ঠিক আছে তুমি চলো আমার সাথে। আমরা বাজুয়া ক্যাম্প সকালে ত্যাগ করলাম, আমি অবাক হলাম আমার সাথের মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়েরা রাত্রে কেউ ঘুমাই নাই, আমি কখন যাব, আমাকে নৌকায় উঠিয়ে দিবে আজো সেই স্মৃতিটা মনে পড়ে আমার চোখে পানি এস পড়ে, আমি দেখেছি তারা অনেকে বাচ্চাদের মতো হুহু করে কেদেঁছে আমাকে পায়ে ধরে সালাম করেছে

দোয়া নিয়েছে আমি তাদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরেছি, যাইহোক বিদায়ের পালা শেষ হলো, আমরা রওনা দিলাম, ঠিক দুপুর নাগাদ খুলনায় এসে আমরা পৌছাঁলাম, ১৮ তাখি বাংলাদেশের প্রত্যেক টা জায়গায় প্রত্যেকটা জেলা প্রায় মুক্ত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু রাজাকারেরা খুলনা শহরটাকে আক্রিয়ে ছিল, ১৬ এবং ১৭ তারিখ মুক্তিবাহিনীরা শহরে ঢুকতে পারিনি, তবে ১৯ তারিখে একটা প্লান হয় যে তাদেরকে চারদিক থেকে আক্রমন করা হবে, সাথে মিত্র বাহিনী ও থাকবে, এই কথা তারা জানতে পেরে ১৭ তারিখ সন্ধার পরথেকে রুপসা পেরিয়ে তারা পালিয়ে গিয়েছিল। ১৮ তারিখ আমি নেমে দেখি পুরা শহরে মিছিল হচ্ছে মানুষ একজন আর একজনকে কোলাকুলি করছে, সে এক অপূর্ব ব্যাপার মিষ্টি খাওয়া খাওয়ি হচ্ছে। আমি আমার সাথে যারা ছিল তাদের নিয়ে হেডকোয়ার্টারে দেখা করলাম, হেডকোয়ার্টার ছিল তখন খুলনা সার্কিট হাউজের অপজিটে সবুর খানের একটা ক্লাব নাম ইউনাইটেড ক্লাব সেখানে। আমরা সেখানে অবস্থান নিলাম, মেজর সাহেবের সাথে দেখা করলাম তার সাথে সালাম বিনিময় হলো, উনি বললেন তোমার এদেরকে ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেও, মুক্তিযোদ্ধাদের তখন অস্থায়ী ক্যাম্প ছিল খালিশপুরের পাশে দৌলতপুরে, আমি থেকে গেলাম হেডকোয়ার্টারে এবং আমার সাথের ভাইদের পাঠিয়ে দিলাম মুক্তিযোদ্ধার অস্থায়ী ক্যাম্পে। আমি হেডকোয়ার্টারে ইউনাইটেড ক্লাবে থাকলাম এখানে মেজর জলিল সাহেব থাকতেন আর ক্যাপ্টেন সুলতান সাহেব থাকতেন দৌলতপুরে। যাক ১৮ তারিখ গেল আমি থাকতে লাগলাম ২২ তারিখে মেজর জলিল সাহেব আমাকে ডেকে বললেন প্রধান মন্ত্রীর কাছ থেকে মেসেজ এসেছে আমি কাল সকালে ঢাকা যাচ্ছি, তাই তোমরা ঢাকার যে কজন আছো তোমরা তৈরি হয়ে যাও তোমরা আমার সাথে যাবে। দীর্ঘ ৯ টা মাস পরে বাড়িতে ফিরবো তাই আনন্দে মন উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। সারাটা রাত আর ঘুমাতে পারিনি, সকালে পাঁচটা গাড়িতে করে আমরা রওনা হলাম। পাঁচ গাড়ির মধ্যে দুইটা গাড়ি যোগাড় করে দিয়েছিলেন ততকালিন বিএলএফ এর কমান্ডার বর্তমান বাগেরহাট জেলাপরিষদের চেয়ারম্যান কামরুজ্জামান টুকু ভাইয়ের ভগ্নিপতি তখনকার এমপি বারি ভাই, আমার সাথে ছিল তখন অশোক দাস, মসলে উদ্দিন, আব্দুর রব, সালাউ দ্দিন চুন্নু, ইউসুফ এবং বরিশালের আর একটা ছেলে ছিল রুহুল আমিন, প্রথম গাড়িতে সামনে বসেছেন মেজর জলিল সাহেব গাড়ি চালাচ্ছে মসলে উদ্দিন পিছনে আমি এবং ক্যাপ্টেন সুলতান উদ্দিন সাহেব। ঠিক সকাল ৭টায় আমরা রওনা দিয়েছি। উদ্যেশ্য রাস্তার মধ্যে কোথাও আমরা নাস্তা সেরে নেব। যশোরে ঢোকার আগে বসুন্দিয়া মোড়ে এসে দেখি রাস্তয় লাইন দেয়া আর্মি, ব্যাপরটা কি ? আমাদেরকে থামালো আমরা সবাই গাড়িগুলি রাখলাম, একজন এসে ড্রাইভারের জানালায় টোকা দিল মসলে উদ্দিন ভাই জানালা খুললে মেজর সাহেবকে দেখে সেলুট দিল এবং তার পরিচয় দিল। সার আমি ল্যাপ্টেন্যান্ট হিডিড, আপনার জন্য স্যার একটা মেসেজ আছে, মেজর মঞ্জুর

সাহেব আমাকে পাঠিয়েছেন আমাদের সাথে আপনাকে সার্কিট হাউজে যেতে হবে। মেজর সাহেব তার সাথে কথা না বাড়িগয়ে বল্লেন ঠিক আছে চলো, সামনে ল্যাপ্টেন্যান্ট এর গাড়ি আমাদেরকে স্কট করে নিয়ে যাচ্ছে এবং পিছনে ওদের অনেক গাড়ি। কিছক্ষনের মধ্যে আমরা সার্কিট হাউজে গিয়ে হাজির হলাম। আমাদের কে নিয়ে একটা বড় হল রুমে বসানো হলো। আমরা সবাই ওখানে বসলাম, ১০/১২ মিনিটের মধ্যে ওখানে খুব স্মার্ট একজন অফিসার ঢুকলেন এসে বললেন আই এম মেজর মঞ্জুর, মেজর প্লিজ মিট টু মি বলে হাত মিলালেন, তার পরে বললেন তুমি তো সব জানো এবং বোঝ, আমি সুধু অর্ডারটা পালন করছি। মেজর সাহেব কে একটা চিঠি দেখালেন তিনি হাতে না নিয়ে পড়লেন, পড়ে বলরেন ঠিক আছে তুমি তোমার দ্বায়ীত্ব পালন করো। মঞ্জু সাহেব বল্লেন তোমার সাথে যে সব মুক্তিযোদ্ধারা আছে তাদের কাছে আর্মস আছে সেগুলো স্যারেন্ডার করে দাও। আমরা একজন আর একজনের দিকে মুখ চাওয়া চাওয়ি করলাম, মেজর জলিল সাহেব ক্যাপ্টেন সাহেবকে বললেন সুলতান সবগুলি আর্মস এদেরকে বুঝিয়ে দাও। মঞ্জুর সাহেব তখন ৮নং সেক্টর কমান্ডার ওনার সাথে ছিলেন ক্যাপ্টেন নাজমুল হুদা। মঞ্জুর সাহেব হুদা সাহেব কে বললেন হুদা তুমি কার কাছ থেকে কি আর্মস পেয়েছো একটা তালিকা করো সব কিছু উল্যেখ করে। আমরা আর্মস দিয়ে দিলাম তারা তালিকায় উল্যেখ করে নিয়ে নিল। আমাদের সাথে পাচঁজন আর্মি কমিসন্ড অফিসার ছিলেন, একজন ক্যাপ্টেইন, চার জন ল্যাপ্টেন্যান্ট এর মধ্যে একজন ডাক্তার ছিলেন, আর মেজর জলির সাহেব ছিলেন। এই পাঁচ জন এবং মেজর সাহেবকে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে চলে গেলেন, মেজর সাহেবের সাথে আমাদের বিচ্ছেদ হয়ে গেল। ওনার সাথে আর আমাদের দেখা হয়নি, কোথায় ছিলেন কেমন ছিলেন আমরা জানতাম না। আমরা যে ঘরের মধ্যে ছিলাম আমাদের কে সেখানেই থাকার ব্যাবস্থা করা হলো এবং বললো পরবর্তী নির্দেশ না আসা পযরন্ত আপনাদেরকে এখানেই থাকতে হবে। আমরা কনফাম হয়ে গেলাম বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে আমরাই প্রথম রাজ বন্দী। যাইহোক বাহিরের কারো সাথে আমাদের কোন যোগাযোগ নেই, পাশাপাশি দুটো রুমে আমাদেরকে থাকতে দিয়েছে আমরা ফ্লোরিং করে থাকি।

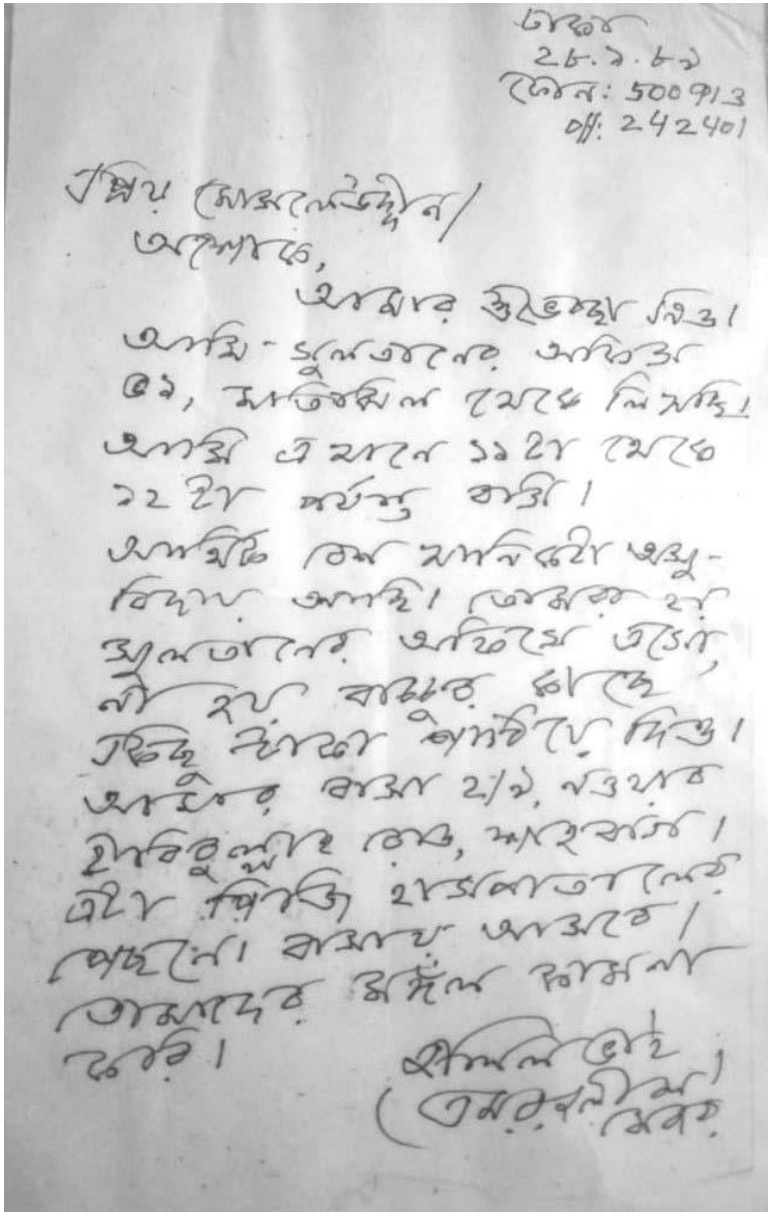

দিন যেতে থাকলো, আমরা ২৩ তারিখে এরেষ্ট হয়েছি, ডিসেম্বর মাস গেল জানুয়ারী মাস যেতে থাকলো হটাৎ জানুয়ারীর ৮ তারিখে আমরা শুনতে পেলাম বঙ্গবন্ধু মুক্তি পেয়েছেন উনি লন্ডন যাচ্ছেন, আমাদের মনের মধ্যে ক্ষিণ একটা

মুক্তির আলো জ্বললো, যে বঙ্গবন্ধু যখন মুক্তি পেয়েছেন তখন আমাদের কিছু একটা ব্যাবস্থা করবেন। আমরা ৯টা মাস অনেক সম্মুখ যুদ্ধ করেছি আমাদের মাঝের অনেক মুক্তিযোদ্ধা চলে গেছেন, এতো কষ্ট করেছি দেশের জন্য তার পরেও কেন আমরা এরেষ্ট হলাম কারো কাছে কোন জবাব পেলাম না, কি আমাদের অপরাধ আমরা কি করেছি? ১০ তারিখ বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরলেন আমাদের বাহিরে সাথে কারো কোন যোগাযোগ নেই এর মাঝে ডিসেম্বরের ২৫ বা ২৬ তারিখ হবে পত্রিকায় খবরটা প্রকাশিত হয়েছিল যে যশোরে মেজর জলিল তার দলবল সহ গ্রেপ্তার। খুব সংক্ষিপ্ত খবর ছিল সেটা পড়েছিলাম। ১২ তারিখে বঙ্গবন্ধু প্রধান মন্ত্রীর শপথ নিলেন, ১৬ তারিখ সকালে আমরা ঘুমের থেকেও ঠিক মতো উঠিনি এমন সময় দরজায় টোকা পড়লো, দেখি সেন্ট্র, সেবললো স্যার আপনারা একটু সকলে ড্রয়িং রুমে আসুন মেজর সাহেব এসেছেন। ঠিক আছে আসছি, আমরা তৈরি হয়ে সকলে গেলাম ড্রয়িং রুমে। দেখলাম ৮নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার মেজর মঞ্জু সাহেব বসে আছেন ওনার সাথে ক্যাপ্টেন নাজমুল হূদা যিনি ৭ নবেম্বর সিপাহি বিদ্রহে হত্যা হয়েছিলেন আর মেজর মঞ্জুর কে জিয়া হত্যায় তাকে ফাঁসি দেয়া হয়েছিল। মেজর মঞ্জুর বললেন আপনারা দেশের সূর্য্য সন্তান দেশ যতদিন থাকবে ততোদিন বাংলার জনগণ আপনাদের সম্মান করেবে কিন্তু আপনাদের এই যে দুঃখ জনক অধ্যায়টা সংগঠিত হয়েছে আমার হাতে, আপনারা বিশ্বাস করুন আমি আজো জানি না কেন আপনাদের কে এতো দিন বন্দি রাখা হলো, আপনাদের অন্যায়টা কি? আমি সুলতান সাহেবকে চিনি, মেজর জলিল সাহেব কে চিনি, ৯ টা সেক্টরে মধ্যে অত্যান্ত যুদ্ধে পারদর্শী যার নাম বিবিসি থেকে প্রচার হতো মেজর জলিলের নাম, আজকে উনি কেন বন্দী হয়ে থাকবেন? যাইহোক ঢাকা থেকে মেসেজ এসেছে অবিলম্বে আপনাদের কে গণভবনে পৌছে দেবার জন্য। আপনারা ঢাকা কয়জন যাবেন? রুহুল আমিন বললো আমি এখান থেকে বরিশাল যাবো তাই ওকে বাদ দিয়ে ক্যাপ্টেন সুলতান কে বললেন তোমার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত আসে নি তাই তোমাকে ছাড়া বাকি সকলকে পৌছে দিতে হবে। কিন্তু একটু সমস্যা আছে আমাকে বলেছে আজকের মধ্যেই গণভবনে পৌছিয়ে দিতে কিন্তু আমাদের যে হেলিকপ্টার আছে সেটা ৪ সিটের, আপনারা এখানে ১২ জন, আমার নিয়ে যাওয়াটা একটা কষ্টকর ব্যাপার হয়ে যাবে। তাই কিছু মনে করবেন না আমি একটা গাড়িতে করে আপনাদেরকে পাঠাচ্ছি, উনি একটা মাইক্রোবাস ঠিক করে দিলেন আমরা রওনা হলাম ৯ টার দিকে, ক্যাপ্টেন সুলতান ভাইকে রেখে আমাদের যেতে মনটা চাইছিল না তার পরেও উপায় নাই তাইওনাকে রেখেই রওনা হলাম। ঢাকা এসে সাড়ে চারটার দিকে পৌছাঁলাম, রাস্তার মধ্যে আরিচা পার করার জন্য আমাদের জন্য বিশেষ ফেরির ব্যাবস্থা ছিল, আমাদের কে নিয়ে যাওয়া হলো গণভবনে, আমরা আসার সময় আমাদের কে যার যার আর্মস বুঝিয়ে দেয়া হয়েছিল তালিকা দেখে।

গণভবনে ঢোকার সময় একজন সিকিউরিটি বললেন আপনারাতো আর্মস নিয়ে ভিতরে যেতে পারবেন না তাই আর্মস গাড়ির ভিতরে রাখুন আমরা এগুলো পাহারা দিব। তো আমরো সেগুলো রেখে ভিতরে গিয়ে দেখি আমাদের জন্য অধির আগ্রহে অপেক্ষা করছেন নারায়নগঞ্জের কয়েকজন নেতা কে নিয়ে মনির ভাই। মনির ভাই বললেন আমরা ১২ টা থেকে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন তখন বুঝলাম আমাদের কে মুক্ত করার জন্য কার চেষ্টা ছিল। মনির ভাই বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করে আমাদের সম্পর্কে বলেছিলেন যে আমার সাথে তারা ট্রেনিং করেছে, আমার সাথে ছিল তারা, আমার সাথে যুদ্ধ করেছে, তারা কি অন্যায় করেছে, আজকে প্রায় একমাস যাবৎ তাদের কে বন্দী করে রাখা হয়েছে যশোরে? বঙ্গবন্ধু সব কিছু শুনে তাড়াতাড়ি মন্ত্রী কে বললেন আমি চাই আজকে এজ আরলি এজ পসিবেল তাদের কে আমার সামনে হাজির করা হোক। ওখানে গিয়ে দেখলাম অনেক নেতা মন্ত্রী যারা আছেন, তাজউদ্দিন সাহেব ও সেখানে ছিলেন, আমরা সবাই বঙ্গবন্ধুকে এক এক করে গিয়ে সালাম করছি কিন্তু আমি বঙ্গবন্ধুকে সালাম করার সময় আমি নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারলাম না। আমি বচ্চাদের মতো হাউমাউ করে কান্না শুরু করলাম ওখানে যত লোক ছিল সবাই চুপ হয়ে গেল, আমি যার নির্দেশে,যার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যুদ্ধ করেছি তার সামনে আমি দাড়িয়ে, একটা হিমালয়ের সামনে যেমন একটা মহিষের শাবক ঠিক তেমনি আমি। আমি আর আমার আবেকটা ধরে রাখতে পারিনি, আমি বঙ্গবন্ধুর পা জড়িয়ে ধরে অনবরত হাউমাউ করে কেদে যাচ্ছি, তখন আমাকে মনির ভাই ও শ্রদ্ধেয় মরহূম মেয়র হানিফ সাহেব ওনারা আমাকে জোর করে উঠালেন। আমি উঠে বঙ্গবন্ধুর দিকে যখন চেয়েছি ওনার চোখটাও ছলছল করছে, উনি মনির ভাইকে বললেন মনির তুই বাসায় নিয়ে যা, ওকে সময় করে আমার কাছে নিয়ে আসবি। আর উনি কোন কথা বলতে পারলেন না। পাশের রুমে আমাদের খাবার ব্যাবস্থা করেছিলেন আমাদে সেখানে নিয়ে গেলেন। আমরা আবেগে এতা আপলুতো হয়ে গিয়েছিলাম যে আমার ওখানে কেউই খেতেপারলাম না তেমন। যাইহোক ওখান থেকে রওনা হলাম। ইউসুফকে আমি বললাম তুমি কি নারায়নগঞ্জ যাবা না এখান থেকে চলে যাবা? ও বললো স্যার আমি তাহলে এখান থেকে বাড়িতে চলে যাই? আমি দুইশতটা টাকা তাকে দিয়ে দিলাম সে ওখান থেকে রওনা হয়ে গেল। আমি মসলে উদ্দিন ও আব্দুর রব আমরা তিনজন মনি ভাইদের সাথে নারায়নগঞ্জ চলে আসলাম। ক্যাপ্টেন সুলতান সাহেবের ভাই সালাউদ্দিন আহম্মেদ চুন্নু কাপাশিয়ায় থাকতো সে কাপাসিয়ায় চলে গেল। আমরা বাসায় এস পৌছাঁলাম। কিন্তু যুদ্ধের পরে আজকে ৫০টা বছর চলে গিয়েছে, একটা জিনিস আমাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে, সেটা হলো কেন আমাদের কে গ্রেপ্তার করা হলো? বহু চেষ্টা করে জিনিসটা জানতে পারি নি, পরে মেজর জলিলের নামে কিছু অভিযোগ দিয়ে ঢাকা ক্যান্টোনমেন্টে আর্মি ট্রাইবুনালে ওনার বিচার হয়েছিল

সেখানে ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান ছিলেন আর একজন সেক্টর কমান্ডার একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল তাহের সাহেব। মেজর জলিলের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ ছিল তিনি তা মিথ্যা প্রমান করে ৭/৮ মাস পরে জেল থেকে বের হয়ে এসেছিলেন।

আমি আজো চিন্তা করি আমি কাকে জিজ্ঞাসা করবো? কে আমাকে এই প্রশ্নের উত্তোর দিবে? যুদ্ধের পরে বিনা দোষে, কার সড়যন্ত্রে, কার দোষে, কার পাপে এতোগুলো দিন বন্দী অবস্থায় আমরা কাটিয়েছি?

যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা
মো. আহসান আলী খান
মুজিবনগর, মেহেরপুর

আমি যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার হাজী মো. আহসান আলী খান (অবঃ)। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান আর্মিতে কোর অব ইঞ্জিনিয়ারে নবীন সৈনিক হিসাবে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে, হোল্ডিং কোম্পানিতে ছিলাম। আমার হোল্ডিং নাম্বার ৪৬১৫, আমরা ৭৫ জন ছিলাম (ইঞ্জিনিয়ার, আর্টিলারী, আরমাড, সিগনাল ও এমওডিসি) প্রতিদিন রুটিন অনুসারে সকল কাজে অংশগ্রহণ করতাম। হোল্ডিং কোম্পানির হাবিলদার মেজর ছিল নুর মহাম্মদ (পাঞ্জাবী), পণ্টাটুন ও সেকশন কমান্ডার ছিল নায়েক রমজান আলী (পাঠান), নায়েক আনারগুল (পাঠান), ল্যান্স নায়েক আব্দুল মালেক (বাঙালি) দেশের অবস্থা ভালো না,সব সময় হরতাল কারফিউ থাকতো। সেনানিবাসে থাকলেও বাহিরের সংবাদ সব সময় রাখতাম। চট্টগ্রাম সেনানিবাসের দক্ষিণ পাশে বায়েজিদ বোস্তামী মাজার ও বাজার। আমি জাফর (ফরিদপুর), হারুন (কুমিল্লা), আজিজ (বগুড়া) ও আলী আহম্মেদ (নোয়াখালী) একই সাথে থাকতাম। বাঙালি ওস্তাদ মালেক প্রায় বলতেন দেশের অবস্থা ভালো না তাই আগামী ৭ই মার্চ ১৯৭১ ইং তারিখ রোজ রবিবার রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনতার মাঝে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান জাতীর উদ্যেশ্যে ভাষণ দেবেন। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনার জন্য অপেক্ষা করি। আমরা বাঙালি সৈনিকরা বেশ বুঝতে পারতাম যে, পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা আমাদের সাথে ভালো আচরণ করতো না। প্রায় সময় গন্ডোগোল হতো, এমনকি হাতাহাতি পর্যন্ত হত। প্রায় সময় এর জন্য সাজা ভোগ করতাম। বাঙালিদের প্যাক ০৮ সবসময় ইট অথবা বালি ভরা থাকতো। আমাদের ব্যারাকটি ছিল একদম পাহাড় ঘেষা। পাশেই বড় ড্রেন ও কুয়া এবং একপাশে ফ্যামিলি কোয়াটার। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য দরকার হলে ইবিআরসি অথবা সিনেমা হল ক্যান্টিনে যেতে হত। লাইন থেকে এলাকা বাহির হতে হলে আমাদের জন্য গেইট পাস দরকার হতো। কিন্তু ওদের কিছুই লাগতো না। ৭ই মার্চ রবিবার সকাল হতে

পুরো সেনানিবাস জুড়ে কেমন একটা থমথমে ভাব। হঠাৎ নির্দেশ জারি হয় যে, কোন বাঙালি রেডিও বা টেলিভিশন শুনবে না। সৈনিক লাইনে কারো রেডিও থাকার কথা না তবুও জোর করে সকলের কাববোর্ড চেক করা হল। আমরা বিকাল আড়াইটার দিকে লুকিয়ে ইবিআরসি এর ক্যান্টিনে গিয়ে, জানতে পারলাম টেলিভিশন চালানো বন্ধ।

চট্টগ্রাম রেডিও, বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ঢাকা রেডিও হতে রিলে করে শুনাবে। আমরা রেডিও শুনার জন্য অপেক্ষায়ই থাকলাম। রেডিওতে গানের মাঝে মাঝে কিছুক্ষনের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু ভাষণ দেবেন। কিন্তু হঠাৎ গান বাজতে বাজতে রেডিও বন্ধ হয়ে গেল। ব্যারাকে ফেরত আসার পথে আরপি চেক পোস্টে আমাদের আটকে দেয়। এর জন্য হাবিলদার মেজর সাজা দেয়। রাতে বিবিসি ও আকাশবানী কলকাতা হতে ঘোষণা দেয় পাক সরকার বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনানোর জন্য রাজি হয়েছে। আগামী ৮ই মার্চ সকাল ০৮:৩০ ঘটিকার সময় ভাষণ প্রচার করা হবে। ভাষণ শোনার জন্য আমরা বাঙালিরা অপেক্ষা করছিলাম। আল্লাহর মেহেরবানীতে আমরা বাঙালি ও পাকিস্তানি সৈনিক মিলে ৫০ জন ইবিআরসি গ্যারিসন মসজিদ এলাকায় মাটি কাটার কাজে যাই। কাজের মাঝে বায়েজিদ বোস্তামী বাজার হতে মাইকে ঘোষণা দেয় যে এখন বঙ্গবন্ধু ভাষণ দেবেন। ভাষণ শুরু হলে আমরা বাঙালিরা কাজ বন্ধ করে দাড়িয়ে যাই। এমন সময় ওস্তাদ আনারুল তেড়ে আসে। যখন বঙ্গবন্ধু বলেন যে “এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, যার যা আছে তাই নিয়ে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো” তখন আমরা সবাই এক সাথে গেতি বেলচা উঠিয়ে “জয় বাংলা”

বলে স্লোগান দেই। পাঞ্জাবী ওস্তাদ যারা ছিল সবাই তেড়ে আসে এবং উর্দুতে বলে "তুম লোক শেখ বনগিয়া, জয় বাংলা মাত বলো পাকিস্তান জিন্দাবাদ বাতাও, তুম লোক হুসমে আজাও" কাজের শেষে ব্যারাকে আসার পর দেখি যত পাঞ্জাবী সৈনিক ছিল সকলে যেন আমাদের নতুন ভাবে দেখছে। বুঝতে পারলাম যে তাদের কাছে অপরাধী। ৭ই মার্চ ভাষণের পর হতে আমরা নতুন জীবনের খোঁজ পাই।

যে সকল বাঙালি সৈনিকরা ফ্যামিলিসহ সেনানিবাসের বাহিরে বসবাস করতেন তারা সেনানিবাসে এসে বলে যে বাহিরের অবস্থা মোটেও ভালো না। টাইগার পাস, নিউমার্কেট সহ শহরের বিভিন্ন এলাকায় বাঙালিরা কারফিউ না মেনে মিছিল সমাবেশ করছে। পাঞ্জাবীরা তাদের উপর গুলি বর্ষণ করে, অনেক বাঙালিদের তারা মেরে ফেলেছে। এই অবস্থায় আমাদের করার কিছুই ছিল না। কারণ বাঙালি সৈনিকরা বাহিরে ডিউটিতে যেতে পারতো না। ২৩ই মার্চ হঠাৎ তিনটি হেলিকাপ্টার ইবিআরসি ট্রেনিং গ্রাউন্ডে নামে। পরে জানতে পারি যে, ইবিআরসি সেন্টার কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে এরেস্ট করে ঢাকাতে নেওয়া হয়। ২৫শে মার্চ সেনানিবাসের সব উঁচু পাহাড়ের উপর ভারি অস্ত্র বসানো হয়। প্রতিটি অস্ত্রের লক্ষ্যবস্তু ছিল ইবিআরসিতে ট্রেনিংরত বাঙালি সৈনিক ব্যারাক, হোল্ডিং কোম্পানির ও ফ্যামিলি কোয়াটার এর দিকে। অবস্থা দেখে আমাদের দম বন্ধ হওয়ার পথে। সকল গেইট বন্ধ। তখন আমরা আল্লাহকে স্মরণ করছি। আমরা বাঙালিরা মনে মনে চিন্তা করলাম যে সুযোগ পেলে ব্যারাক ছেড়ে পাহাড়ের ঐপারে চলে যাবো। ২৫শে মার্চ সন্ধ্যা বেলা রোলকল প্যারেডে রেজিস্টার অনুযায়ী নাম ডাকা হয়। সকল সৈনিক উপস্থিত হওয়াতে কোন প্রকার সমস্যা হয় নাই। সিএইচএম প্রতিদিনের ন্যায় অর্ডার শুনাই। হঠাৎ কোম্পানী কমান্ডার ক্যাপ্টেন সুবিদ আলী ভূঁইয়া প্যারেডে উপস্থিত হওয়ায় সিএইচএম একটু ঘাবড়ে যায়। কোম্পানি কমান্ডারকে প্যারেড হ্যান্ডওভার করার পর একপাশে সরে দাড়াই। ক্যাপ্টেন সুবিদ আলী ভূঁইয়া সকলের মনের অবস্থা জানতে চায়। আমরা

একসাথে আওয়াজ করে বলি যে, "ভালো আছি স্যার"। তিনি বলেন যে "খুব মন দিয়ে শুনবে গত ৭ই মার্চ হতে আমরা বাঙালিরা কিন্তু সব চোখে চোখে আছি। সেনানিবাসের সব উঁচু পাহাড়ে ভারি অস্ত্র লে আউট আছে, অতএব সতর্ক থাকবে, খোদা হাফেজ"। এবং প্যারেড শেষ করার আদেশ দিয়ে চলে যান। পরে সিএইচএম বেশ কড়া ভাষায় বলে যে, "ক্যাপ্টেন সাব যো কুছ বাতাইয়া মুঝে মালুম নেহি, মেরি বাথ ধ্যানসে শুনলো প্যারেড খতমছে কোই আদমি বাহার নেহি জাওগি, আপনা বেডপর যা কর আরাম কর গি, আপনা কামরামে কোই বাতি নেহি জালেগি, মেরি বাথ বর খেলাপ হোনেসে সারেকো বহুত সাজা মিলেগি"। আমরা লক্ষ করি যে সিএইচএম এর চোখে মুখে কেমন যেন ভয়ের ছাপ ফুটে উঠে। প্যারেড শেষে যে যার রুমে চলে যাই। বার বার ভূঁইয়া সাহেবের কথা মনে পরছিল। ভারি অস্ত্রের কথা কি বুঝাতে চেয়েছিল! অন্যদিন আমাদের সৈনিক লাইনে বাঙালি পাঞ্জাবী মিলে ডিউটি পড়তো, কিন্তু আজ উল্টো। রাত আনুমানিক এগারোটার দিকে দেখি যে, সিএইচএম ও লাইন ডিউটির পাঞ্জাবী সৈনিকরা অস্ত্র হতে ডিউটি করছে। আমরা কিন্তু তখন কোন কিছুই অনুভব করতে পারি না,শুধু মনে হচ্ছিলো বাঙালি সৈনিকদের বাদ দিয়ে এসব করার কারণ কি? একসময় বুঝতে পারলাম যে লাইন ডিউটি প্রহরি বাহির হতে সব দরজার সিটকিনি আটকিয়ে দেয়। তখন মোটামুটি বন্দি বলে সবাই ধরে নিলাম আমরা। কিছুক্ষণ পরে ইলেকট্রিক মেইন সুইচ অফ হয়ে যায়। তখন মনে হয় এবার বুঝি আমাদের উপর কোন বিপদ নেমে আসবে। ২৫শে মার্চ রাত বারোটা বাজার কয়েক সেকেন্ড পরই, ইবিআরসি কোয়াটার গার্ড রুম হতে হোল্ড হ্যান্ডস আপ আওয়াজ আসে এবং সাথে সাথে গুলির আওয়াজ আসে। তখন "বাবাগো মাগো চিৎকার" করে উঠে বাঙালিরা। পাহাড়ের উপর রাখা অস্ত্রগুলোর ফায়ার শুরু হয়। তখন আমরা ঝটপট যার যার রুমের পিছনের জানালার কাচ ভেঙে গ্রিল টেনে বাঁকা করে রুম হতে বাহির হয়ে মৃত্যুকে ভয় না করে গোলাগুলির ভিতরেই পাহাড়ের ঐপারে চলে যাই। তখন সিএইচএম নুর মোহাম্মদ চিৎকার করে বলে "ইন্ডিয়ানে এটাককিয়া শের মাত উঠাও, সো জাও"। পাহাড় এর উপর হতে যতদুর নজর যায় বন্দুকের ব্যারেলের আগুনের ফুলকি আর ফুলকি। আমাদের ব্যারাক সহ সব বাঙালি ব্যারাকগুলি আগুন ধরে যায়, ধারণা করি যে যারা বাহির হতে পারে নাই সবাই পুড়ে মারা গেছে। ব্যারাক হতে বাহির হওয়ার সময় আমার পরনে হাফ প্যান্ট ও গেঞ্জি পরা খালি পায়ে, পাহাড়ের নিচে একটু আড়ে সবাই একত্রিত হই। ওস্তাদ মালেক একটা হিসাব করে হোল্ডিং কোম্পানির অর্ধেক বাহির হতে পারেনি। মর্টারের গোলা পাহাড় এর মধ্যে পড়তে শুরু করে। আমরা অন্ধকারে পাহাড় এর কোন দিকে যাচ্ছি বুঝতে পারছিলাম না। অনেক দূর হতে ফজরের আযান শোনা যাচ্ছিলো।

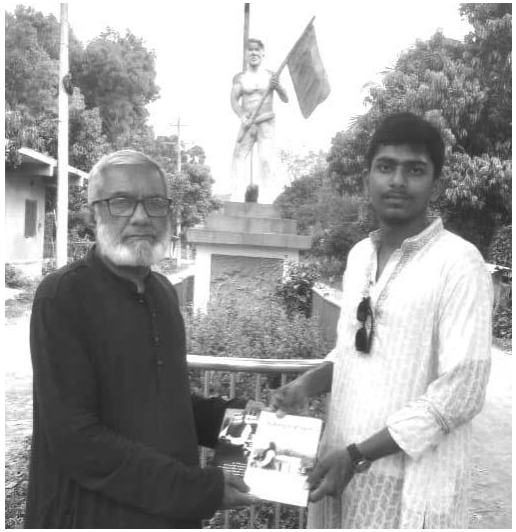

রাস্তায় অনেক বাঙালি আহত সৈনিকদের সাথে দেখা হয়। অনেকেই আহত, শরীর থেকে রক্ত ঝরছে। পাহাড়ী কাঁটা, লতা-পাতায় আমাদের শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়। আযানের পরেই মাইকে প্রচার হয় যে, সেনানিবাস হতে যে সকল বাঙালি সৈনিক ভাইরা বাহির হয়ে পাহাড় এর ভিতর পথ হারিয়ে ঘোরাঘুরি করছেন সবাই ভাটিয়ারী দিকে চলে আসেন। ২৬শে মার্চ পূর্ব আকাশ পরিষ্কার হলে দিক ঠিক করে হাটা শুরু করি। রাস্তায় আওয়ামীলীগ এর উদ্ধার কর্মীর সাহায্যে সমতাল ভূমিতে আসি। সেখানে প্রথমিক চিকিৎসা ব্যাবস্থা থাকায় আমরা প্রাথমিক চিকিৎসা নেই। উপস্থিত আওয়ামীলীগ নেতা কর্মীরা যথেষ্ট সাহায্য করে এবং বলে যে, আপনারা আল্লাহর মেহেরবানীতে মৃত্যুর হাত থেকে ফেরত এসেছেন। তখনো পাক বাহিনী সেনানিবাস এলাকা হতে বাহির হয়ে অন্য জাইগায় যায়নি। জানতে পারলাম অপারেশন সার্চ লাইট ঘোষণা করে সারাদেশে নিরস্ত্র জনগণকে হত্যা করেছে। পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় আমি, জাফর ও আজিজ সহ ভাটিয়ারী বাজার থেকে সাগরের দিকে একটা পুকুর পাড়ে যাই। উভয়ের মধ্যে আলোচনা করি দেশের যে অবস্থা আমরা দেশের বাড়ি যেতে পারবো না, তাই সিদ্ধান্ত নেই যে, দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আমরা বাড়ি যাবো না। পাড়ার লোকজন জানতে চায়, আপনারা কিভাবে সেনানিবাস হতে বাহিরে আসলেন? যারা আসতে পারে নাই তাদের কি অবস্থা? আমরা যতটুকু জানি যে, বাঙালিদের ব্যারাকগুলোতে গুলি করে ঘুমন্ত অবস্থাই মেরে ফেলে। হঠাৎ মাইকে ঘোষণা হয় যে, যে সকল সৈনিক ভাইয়েরা সেনানিবাস হতে এসেছেন সবাই রাস্তার পাশে অপেক্ষা করেন। আওয়ামী লীগের সংগ্রাম কমিটির সদস্যরা বাস ট্রাক নিয়ে সকলকে একত্র করার ব্যাবস্থা নিয়েছে। মনে অনেক সাহস পেলাম। এমন সময়

একটি দশ বারো বছরের ছেলে ছুটে আসে এবং বলে "কাকু আপনাদের সারাদিন খাওয়া হয়নাই, আমরা হিন্দু যদি ইচ্ছা করেন আসেন আমাদের বাড়িতে খাবেন"। সত্যি বলতে কি সারাদিন না খাওয়া, ভাত সামনে পেয়ে আনন্দে চোখ বেয়ে পানি পড়ে এবং আত্মীয় স্বজন এর চেহারা ভেসে ওঠে। খাওয়ার পর রাস্তার ধারে আসি, বাংলাদেশ এর মানচিত্র খচিত পতাকা লাগানো তিনটি মানুষ ভর্তি ট্রাক আসে। ট্রাকে উঠে বসার পর কোথায় যে গেলাম আমি জানি না। মাইক এ ঘোষণা আসে যে, কুমিল্লা সেনানিবাস হতে পাক আর্মি আসছে চিটাগাং ধ্বংস করার জন্য। ২৬শে মার্চ শুক্রবার বিকালে ক্যাপ্টেন সুবিদ আলী ভূইয়ার নেতৃত্বে কুমিল্লা টিবি হাসপাতালে যাই। সেখানে তিনি ব্রিফিং দেয় যে, কুমিল্লা সেনানিবাস হতে ৫৩ ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার ইকাবাল সফি মুভ করেছে সাথে আছে ২৪ ফ্রন্টিয়ার ইঞ্জিনিয়ার ডিটাচমেন্ট, ৮৮ মর্টার ব্যাটারী সাথে আসছে। পাকিস্তানি বাহিনীকে বাধা দেওয়ার জন্য ক্যাপ্টেন সুবিদের অধিনে কুমিল্লায় ফাঁদ পাতা হয়। স্থানীয় জনগণ, সেনাবাহিনী সদস্য, ইপিআর, পুলিশ, ছাত্রজনতা, নিয়ে বাম দিকে সমুদ্র ডানদিকে পাহাড় ও ঘন গাছ, মাঝখানে চট্টগ্রাম এর রাস্তা। নিয়মিত বাহিনীর সংখ্যা ছিল মাত্র ১০০ জন। জনগণ ছিল কয়েক শত। অপেক্ষায় থাকি সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার দিকে পাক আর্মির কনভয় আমাদের ফাঁদ এলাকায় আসে। তারা গাড়ি থেকে নেমে রাস্তার ব্যারিকেট সরাতে থাকে। আমাদের ফায়ার রেঞ্জে আসলেই ফায়ার শুরু করি। তারা এদিক ওদিক পালানোর চেষ্টা করে। যেদিকে যায় সেইদিকেই জনগণ এর কাছে বাধা পায় এবং যার কাছে যা ছিলো তাই দিয়ে আঘাত করে। শেষে পাক বাহিনী পালাতে বাধ্য হয়। পাক বাহিনীর প্রায় ১৫০ জন মারা যায়। আমাদের শহীদ হয় ১৪ জন। বিরাট এই শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়েছিল এই কারণে যে আমাদের মনে ছিল ক্ষোভ ও আবেগ। আপারেশন শেষে আমরা গাড়িতে চট্টগ্রামের দিকে যাই এবং হাজী ক্যাম্পে বাকি রাতটুকু কাটাই। সারারাত বিভিন্ন প্রকার অস্ত্রের ফায়ারের শব্দ আসে। সকাল বেলা হাজী ক্যাম্পে একজন বিহারীকে পাওয়া যায়। পাবলিক তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। ২৭শে মার্চ সকালে ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম ইপিআর (সাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) নিজের পরিচয় দিয়ে সবার সাথে কথা বলেন। তিনি বলেন যে, জাতি আজ বিপদের মধ্যে। পাক বাহিনী আপারেশন সার্চ লাইট ঘোষণা দিয়ে নিরস্ত্র জনগণের উপর আক্রমণ করে। আপনারা এখানে যারা আছেন সবার বাড়ি নিশ্চয়ই নদীর ওপারে।

গতকালের প্রতিরোধ আমাদের মনে অনেক সাহস যুগিয়েছে, আমরা কোন অস্ত্র নিয়ে আসতে পারি নাই। ইপিআর এর কিছু অস্ত্র আছে তাই দিয়ে আমাদের পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে হবে। আমাদের কয়েকটি প্লাটুনে ভাগ করা হয়। আমি ১নং প্লাটুনে পড়ি। অস্ত্র সংগ্রহ করার পর গাড়িতে করে সিতাকুন্ডে আসি। ১নং প্লাটুনের ৩নং সেকশন আমি, জাফর, আজিজ ও আরো সাত জন ছিলাম। আমরা রেললাইন ছেড়ে সাগরের কিনারা দিয়ে হাটা শুরু করি এবং হঠাৎ ফায়ারের আওয়াজ শুনি, দেখি যে চারিকদিকে জনগণ ছুটাছুটি করছে। সেই সাথে আমরাও সাগরের দিকে দৌড়ে পানির কিনারায় আসি এবং হাত দিয়ে বালি সরিয়ে গর্ত করে পজিশনে যাই। কিছুক্ষন পরেই জোয়ার শুরু হলে পানির ধাক্কায় ভেসে কিনারার দিকে যাই। ভাসতে ভাসতে অনেক দূর যাই এবং কতক্ষণ এই অবস্থা ছিলাম বলতে পারবো না। চরে মরা গাছে আটকানো অবস্থায় গ্রামের লোকজন আমাদের সাহায্য করে। রাতে একটা প্রাইমারী স্কুলে আমরা অবস্থান করি। ২৮শে মার্চ গাড়ীতে অস্ত্রসহ মিরশরাই চেকপোস্টে আসলে আর্মি ও পুলিশের কিছু সদস্য আমাদের গাড়ি থেকে নামিয়ে রাখে এবং রেজিস্টারে নাম লেখায়। অল্প সময়ে অনেক সৈনিক উপস্থিত হয়। ঘোষণা হয় যে, শুভপুর ব্রিজ মুক্ত করার জন্য, আমাদের করেরহাট দারোগা বাজার পাঠানো হয়। সেখানে সেনা, পুলিশ, মুজাহিদ, ছাত্র, ইপিআর ও সাধারণ জনগণ একত্রিত হয়। ক্যাপ্টেন সুবিদ আলী ভূঁইয়া সংক্ষিপ্ত ব্রিফিং এ বলেন যে, আজ বিকাল ৩ ঘটিকার সময় ইপিআর এর মর্টার প্লাটুন হতে ফেনীর দিকে শুভপুর ব্রিজে এক রাউন্ড গোলা ফায়ার করা হবে। তখন সবাই আল্লাহু আকবর, জয় বাংলা বলে ফায়ার করতে করতে উপরের দিকে অগ্রসর হবে। আমরা ব্রিজের দারগা বাজার সাইডে সুবেদার মেজর

ফকর উদ্দিন ইপিআর এর নির্দেশ অনুযায়ী পজিশন নেই। যথা সময়ে মর্টার এর এক রাউন্ড গোলা ফায়ার হয়। সাথে সাথে আল্লাহু আকবর ও জয় বাংলা আওয়াজ দিয়ে ফায়ার করতে করতে সামনে অগ্রসর হই। পাক সেনারা ব্রিজের এভাটমেন্ট এ পজিশন এবং আমরা নিচে পজিশন নেই। শত্রুর গুলি কানের পাশ দিয়ে মাথার চুল টাচ করে শো শো করে চলে যায়। আল্লাহর ইচ্ছাই শরীরে লাগে নাই। আল্লাহ যেন গুলির গতি অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেন। মৃত্যু, বড়ই ভয়ংকর, খুব কাছে থেকে দেখেছি, অনুভব করেছি, সব যুদ্ধই ছিল ভয়াবহ। সময় না হলে মৃত্যু হয় না। এই যুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনীর ৭ জন ধরা পড়ে। জনগণ তাদের পিটিয়ে মেরে ফেলে। আমাদের দুই জন মারা যায়। তারা হলেন নায়েক হাসেম ইপিআর ও লুৎফর ইপিআর। তাদের করেরহাট বাজারে করব দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় সবাই করেরহাট স্কুলের মাঠে (দারোগা বাজার ও রামগড় রাস্তার মাঝে) একত্রিত হয়। রাতে খাবার পর সুবিদ আলী ভূইয়া বলেন যে, এই স্থান নিরাপদ না। যেকোন সময় আক্রমণ হতে পারে তাই আমরা রাতটুকু অন্য জায়গায় কাটাবো। আমরা কয়েকজন একটা ট্রাকে করে রামগড় রোডে গেলাম। যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই ইপিআর চেকপোস্টে গাড়ি থামায় এবং বলে যে, সামনে আর গাড়ি যাবে না। সবাই গাড়ি থেকে নেমে পড়ি এবং বাকি রাত ওই ক্যাম্পেই থাকি। রামগড় ইপিআর ক্যাম্প কমান্ডার ওয়ারলেস এর মাধ্যমে সিনিয়রকে আমাদের কথা জানায় পরবর্তী আদেশ এর জন্য। ২৯ মার্চ সকালের নাস্তার পর পরই করেরহাটের দিক হতে ৭/৮ টা চাঁদের গাড়ী আসে। ওই গাড়ীতে আমরা বসি। লেঃ অলি আহমেদ এর নির্দেশে রামগড় চা বাগানে কিছুক্ষণ গাড়ী অপেক্ষা করার পর রামগড় থানা মাঠে এসে থামে। ওইখানে সমস্ত সৈনিক ফলিন হই। তালিকা সহ অস্ত্র গোলাবারুদের হিসাব করা হয়। মোট জনবলকে তিনটি প্লাটুনে ভাগ করা হয়। আমি ১ নং প্লাটুনে পড়ি। প্লাটুন কমান্ডার ছিল বাহাদুর। আমাদের সেকশনের ডিউটি পড়ে রামগড় হতে হেকো, কয়লা শহীদ বাজার, দাত মারা বাজার পর্যন্ত। গাড়িতে করে টহল দেই। যে সকল জনগণ বাড়ি ঘর ছেড়ে নিরাপদ স্থানে যাওয়ার জন্য তাদের মালামাল যেন সন্ত্রাসীরা কেড়ে নিতে না পারে তার জন্য আমরা ডিউটি করতাম। আমি ওই সেকশনে টুআইসির দায়িত্ব পালন করি। দুইদিন টহল ডিউটি করার পর আমরা চেঞ্জ হই। পরবর্তিতে আমাদের দায়িত্ব পড়ে রামগড় থানার নিচে ফেনী নদীতে জনগণ কে পারাপারে সাহায্য করা। এই রকম চলতে থাকে। ৫ এপ্রিল সকালে মাঠে মেজর জিয়ার নির্দেশে ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান অষ্টম ব্যাটালিয়ান এর একটি কোম্পানী নিয়ে পানি পথ মহালছড়ি-রাঙ্গামাটি নিরাপদ রাখার জন্য। বিকাল বেলা অস্ত্র ও গোলাবারুদ সহ ৭-৮টা চাঁদ এর গাড়ী করে রামগড় থেকে পাতাছড়া, গুইমারা, বড় পিলাক, সিন্ধুকছড়ি, ধুমনিঘাট ও পংক্ষিমুড়া হয়ে মহালছড়ি থানায় আসি। মাহালছড়ি

থানায় আসার পর আমরা আদেশ পেলাম এলএমজি ও এমজির গুলি বেল্টে লোড করার জন্য। রাতের খাওয়ার কোন ব্যাবস্থা হলো না কোন রকম রাত কাটাই। ৬ এপ্রিল সকালে থানাতে রান্নার ব্যাবস্থা হয়। খাওয়ার পর নদী ঘাটে কয়েকটি লঞ্চ ও দেশী ইঞ্জিনচালিত বোট এ করে মহালছড়ি ও রাঙ্গামাটি পানি পথ নিরাপদ রাখার জন্য বাহির হই। অনেক রাতে হঠাৎ লঞ্চ থেমে যায়। সারেং বলে যে সামনে রাঙ্গামাটি জলজান ঘাট পাক সেনারা ডিউটিতে আছে। তখন ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান এর নির্দেশে লঞ্চ পিছনে ঘুরিয়ে চাকমা রাজার ঘাটে থামে। নিরাপত্তার জন্য ডিউটি দিয়ে বাকিরা রেস্ট করে। ৭ এপ্রিল শনিবার ভোরবেলা সবাই জেগে লঞ্চে বসে হাত মুখ ধুই। আমার পাশেই ইপিআর এর একজন সৈনিক ব্রিটিশ এলএমজি নিয়ে বসা ছিল, লক্ষ করলাম হাত মুখ ধোলাই করলো না। লঞ্চে বসেই বা হাত দিয়ে পানি নাড়াচাড়া করছিল। এবং মাঝে মাঝে হাত ভিজিয়ে চোখে মুখে পানি দিচ্ছিল এবং তাকে দেখে মনে হচ্ছিল খুব চিন্তিত। এমন সময় বেশ দূরে ইঞ্জিনের শব্দ ভেসে আসে। প্রথমে মনে হল ইঞ্জিনচালিত বোট। ক্যাপ্টেন সাহেব ও সারেং ভালো করে দেখে এবং বুঝতে পারে যে পাক বাহিনীর একটা লঞ্চ। সাথে সাথে আমরা লঞ্চ ছেড়ে দিয়ে পাড়ে পজিশনে যাই। পাকিস্তানি লঞ্চটি আমাদের দিকে আসতে আসতে হঠাৎ থেমে যায়। সেখান থেকে আমাদের লঞ্চ লক্ষ করে রকেট ফায়ার করে। ফলে আমাদের লঞ্চটি ডুবে যায়। কোন প্রতিউত্তর না পাওয়ায় পাক সেনারা ফিরে যায়। সবাইকে একত্রিত করার পর ক্যাপ্টেন সাহেব বলেন যে, সেদিন রাতে লঞ্চ নিয়ে ফেরত আসাতে পাক বাহিনী চারিদিকে টহল জোরদার করে। দুপুরের পর দুইটি মাছ ধরা জেলে নৌকা ব্যবস্থা করি। নৌকার মাঝিরা ছিলো সবাই সিলেটি। তাদের মাছ ধরা সাহায্য করি এবং চারিদিকে খেয়াল করে রাঙ্গামাটির দিকে যেতে থাকি। পাক বাহিনীর একটি স্পীডবোর্ড আমাদের নৌকার দিকে আসতে দেখে মাঝি ইশারায় বুঝায় পতাকা দেখিয়ে "পাকিস্তান, পাকিস্তান হায়"। তারা কাছে না এসে অন্যদিকে চলে যায়। আমাদের বহনকারী নৌকা রাঙ্গামাটির দিকে চলতে থাকে। বিকালে পাক বাহিনীর তিনটি স্পীডবোট আমাদের নৌকা থামায় এবং কাছে এসে চেক করার জন্য একজন পাক সেনা আমাদের নৌকায় আসে। মাঝি তাকে বুঝায় যে "হাম পাকিস্তান হেই" সাথে পাকিস্তানি পতাকা দেখায়। অন্য বোট থেকে একজন হাবিলদার বলে "ঠিক হেয় তুম জাও, জয় বাংলা মুক্তি দেখা তো মুঝে বাতাইয়ে, তুম মুসলিম, ম্যায় মুসলিম, তুম মেরা দোস্ত হেয়"। আমারা পাটাতনের নিচে থেকে সব কিছু অনুভব করছিলাম এবং প্রস্তুত ছিলাম। সবাই যদি নৌকায় উঠে তাহলে আক্রমণ করবো। পাক সেনারা চলে যাওয়ার পর ক্যাপ্টেন সাহেব বলেন যে, দুইবার বিপদ হতে রক্ষা পেয়েছি এবার আমাদের নৌকা ছেড়ে দিতে হবে। আমরা সন্ধ্যার আগে নানিয়ার চর রাঙ্গামাটি নদীর মাঝপথে অবস্থিত বুড়ির হাট

টিলায় অবস্থান নেই। বুড়ির হাট টিলার তিন দিকে পানি একদিকে নালা তারপর হলো জঙ্গল। সারা রাত জোঁক ও মশার সাথে যুদ্ধ করতে হয়। ৮ এপ্রিল ভোরবেলায় ক্যাপ্টেন সাহেব বলেন যে "এই টিলায় থাকতে হবে, সকলে সতর্ক অবস্থায় থাকবে এবং চারিদিকে লক্ষ রাখবে শত্রু এর চোখ হতে বাঁচার জন্য বেশি চলাফেরা করা যাবে না, গাছের নিচে ঝোপ ঝাড়ের পাশে অবস্থান করবে"। আনুমানিক বেলা দুইটা তিনটার দিকে পাকিস্তান সেনার কমান্ডো ব্যাটেলিয়ান এর দুই কোম্পানী সৈনিক সাতটা স্পীডবোড ও দুইটি লঞ্চ নিয়ে বোট বুড়ির হাট এর দিকে আসতে থাকে। আমাদের অবস্থান টের পেয়ে তারা অতর্কিত আক্রমণ করে। পাক সেনাদের লঞ্চে তিন ইঞ্চি মর্টার বসানো ছিল। এক সময় আমাদের অবস্থানের উপর মর্টার সেল ফেলা শুরু করে। ছোট টিলায় আমাদের অবস্থা হয়েছিল খই মুড়ি ভাজার মত। শেষে ক্যাপ্টেন অর্ডার দেয় পিছনে নিরাপদ এ অবস্থান নিতে। আমরা যারা রাইফেল ম্যান ছিলাম সবাই নালা পার হয়ে অবস্থান নেই। ইপিআর এর এলএমজি ম্যান মুন্সি আব্দুর রউফ (বীরশ্রেষ্ঠ) ফায়ার দিয়ে পাক সেনার সাতটা স্পীডবোর্ড অকেজো করে দেয়। তখন বাধ্য হয়ে তারা পিছনে চলে যায় এবং পুনরায় মর্টার সেল ফেলা শুরু করে। হঠাৎ একটি সেল মুন্সি আব্দুর রউফ এর গানের উপর পড়ে এবং সাথে সাথে ফায়ার বন্ধ হয়ে যায়। একা কভারিং ফায়ার দিয়ে এবং নিজের জীবন দিয়ে সকলের প্রাণ রক্ষা করেন। তার দেহের শত শত টুকরোগুলো একত্রিত করে বুড়ির হাটে সমাহিত করা হয়। মুন্সি আব্দুর রউফ আমাদের মাঝে স্মরণীয় হয়ে আছেন। আমরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে যার যার অস্ত্র সহ বন, জঙ্গল, পাহাড়, টিলা, ঝরনা পার হয়ে পায়ে হেটে নয়নছড়ি পৌঁছাই। চাকমাদের সাহায্যে দেশি নৌকা করে মহালছড়ি থানায় পৌঁছাই ভোর রাতে। ৯ এপ্রিল আমরা কয়েকজন মাহালছড়ি থানার কোত ভেঙে কিছু গুলি নিয়ে রামগড় আসার জন্য প্রস্তুত হই। ১০ এপ্রিল আমরা রামগড় থানায় পৌঁছাই। ক্যাম্প কমান্ডার লেঃ অলি আমাদের সব বিষয়ে অবগত হয়ে বলেন যে পরবর্তী আদেশের জন্য অপেক্ষা করতে সন্ধ্যার কিছু আগে ফলিন এর আদেশ আসে সবাই একত্রিত হলে আদেশ শুনানো হয় যে, গত ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলা বিশাল আমবাগানে সৈয়দ নজরুলকে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট করে, তাজউদ্দিন, ক্যাপ্টেন মুনসুর ও কামরুজ্জামান কে নিয়ে অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়েছে। কর্নেল আতাউল গণি ওসমানী কে প্রধান সেনাপতি করে যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য দেশকে এগারোটি সেক্টরে ভাগ করা হয়। চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী নিয়ে এক নম্বর সেক্টর গঠন করে। ১নং সেক্টর কমান্ডার হিসাবে মেজর জিয়াকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১নং সেক্টর কমান্ডার মেজর জিয়া আদেশ দেন যে, করের হাট রামগড় সড়কে রোড ব্লকের ব্যবস্থা নিতে হবে এবং সতর্ক ব্যাবস্থা নিতে হবে। ৩নং সেকশন কমান্ডার মোজাম্মেলের সাথে আমি সেকশন টুআইসি রামগড় চা

বাগানে অবস্থান নেই। ২৪ এপ্রিল আনুমানিক একটা দেড়টার দিকে চা বাগানের উপর সেলিং শুরু হয়। ভাবগতি দেখে কমান্ডারের নির্দেশ মোতাবেক পাশে ফেনী নদী পার হয়ে ভারতের সাব্রুম এলাকায় প্রবেশ করার সময় ভারতীয় বাহিনী বাধা দেয় এবং ফায়ার শুরু করে। তখন আমরা বাধ্য হয়ে অস্ত্রসহ হাত উঠিয়ে আওয়াজ করতে থাকি, "জয় বাংলা, জয় বাংলা"। শেষে বন্ধু হিসাবে আমাদের গ্রহণ করে। প্রচন্ড সেলিং হচ্ছিলো। কিছু কিছু গোলা ভারতের মাটিতেও পরতে থাকে। তখন আমরাও ভারতীয় বিএসএফ একসাথে ফায়ার করতে থাকি। ফায়ার শেষে আমরা কোন দিকে যাবো কোন নির্দেশনা না পেয়ে সাবরুম বাজারে একটা চায়ের দোকানে বসেছিলাম। আনুমানিক রাত সাত ঘটিকার সময় মাইকে ঘোষণা হয় যে, "সকল বাঙালি সৈনিক বাজারে এদিক ওদিক আসেন সবাই পাকা রাস্তায় চলে আসেন" সকলে পাকা রাস্তায় আসার পর ভারতীয় বাহিনীর সেনাবাহিনীর শক্তিমান গাড়ী, লরি করে প্রায় ত্রিশ মিনিট চলার পর এক জায়গায় গাড়ী থামে। সেখানে অনেক চেনা জানা মানুষের সাথে দেখা হয়। জানতে পারলাম এটি এক নম্বর হেড়কোয়াটার, এলাকার নাম হরিণা। ২৫শে এপ্রিল সকালে আমরা সবাই ফলিন হই। সেক্টর এডজুটেন্ট আদেশ যে, আজ সন্ধ্যার ভিতর নিজেদের থাকার জন্য টিলা কেটে জঙ্গল পরিষ্কার করে ঘর তৈরি করতে হবে। যে কথা সেই কাজ। ভারত সৈন্যের গেতি বেলচা দিয়ে কাজ শুরু। ২৬শে এপ্রিল সেক্টর কমান্ডার মেজর জিয়া ক্যাম্প এলাকা পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন যে আমার একটি স্পেশাল ভলেন্টিয়ার প্লাটুন দরকার, এই প্লাটুন ফেনী সোনাপুর যাবে একটি বিশেষ অপারেশনে। যদি ওই এলাকার কেউ থাকে তাহলে ভাল হয়। আমরা কয়েকজন লাইন হতে আগে আসলাম, মেজর জিয়ার নির্দেশ মোতাবেক তালিকা তৈরি করা হয়। অর্ডার হলে এই দল সি টাইপ অস্ত্র সহ রেডি থাকবে। আদেশ পাওয়ার সাথে সাথে যেন এরা মুভ করতে পারে। ২৭ এপ্রিল একজন ক্যাপ্টেন (নাম মনে নাই) সাথে মেজর জিয়া সাহেব ব্রিফিং করেন যে, এই দল নোয়াখালী জেলার ছাগলনাইয়া ও ভারতের আমলী ঘাট বিএসএফ বিওপি তে যাবে। সেখান থেকে গাইড এর সাহয্যে বাংলাদেশে গাইড এর মাধ্যমে প্রবেশ করবে। আদেশ পাওয়ার পর বিকাল বেলা অস্ত্রসহ শক্তিমান লরিতে করে রাত আনুমানিক ৭টার দিকে আমলীঘাট বিওপি তে পৌঁছাই। খাওয়ার পরে দেখি যে মেজর জিয়া ও লেঃ অলি আমাদের একজন গাইড দিলেন এবং বললেন যে, এই দল ফেনী সোনাপুর গ্রামে একজন কুমিল্লা সেনানিবাসে বন্দি ডাক্তার ক্যাপ্টেন এর ফ্যামিলিকে উদ্ধার করতে। সেকশন কমান্ডার নায়েক বশির ইপিআর এর নেতৃত্বে চলা শুরু করলাম গাইড এর পিছনে। মেঘলা রাত রাস্তাঘাট কাদাময়, চলতে চলতে ভোরের আযান শুরু হয়। আমরা চলা বন্ধ করে নিরাপদ স্থানে অবস্থান নিই। আকাশ পরিষ্কার হলে একটি টিনের খালি বাড়ির ভিতরে আমরা অবস্থান

করি। গাইড বলে যে, এই গ্রামে কোন জনগণ নেই সবাই ভারতে চলে গিয়েছে। আমরা নিজেদের গোপনীয়তা রক্ষা করে পাহারায় থাকি আনুমানিক আড়াইটার দিকে খাবারের ব্যাবস্থা হয়। সবাই খাবারের জন্য রেডি হই, এমন সময় সিএন্ডবি রোডের দিক হতে এলোপাতাড়ি ফায়ার শুরু হয়। আমরা খাওয়া ফেলে ওই স্থান ত্যাগ করি। ফেনী নদীর পাড়ে আড় দেখে অবস্থান নেই এবং দশ দিন ওই এলাকায় থাকি এবং বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করি। কিভাবে টারগেটে পৌছানো যায়। আমাদের গাইড আগেই পালিয়ে গিয়েছিল। ৬মে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলা ওই বাড়িতে পৌছাই এবং বাড়ির মালিক চাচা কে সবকিছু খুলে বলি। তিনি আমাদের খাওয়া থাকার ব্যাবস্থা করে। আমরা ওই রাতের মধ্যেই ছাদের উপর এলএমজি পোস্ট সহ নিচে ব্যাংকার তৈরি করি। ৮ মে পাক বাহিনীর একটি হেলিকপ্টার আমাদের পজিশনের উপর দিয়ে উড়ে যায়। এলএমজি বসানোর আগেই হেলিকপ্টারটি রেঞ্জের বাহিরে চলে যায়। পুনরায় আসবে এই আশায় এলএমজি তাক করে বসে থাকি। বিকাল বেলা গ্রামের কয়েকজন মুরুব্বি আসে এবং বাড়ির মালিক চাচার সাথে আলাপ করে, তারা বলে যে, মুক্তিযোদ্ধারা আসার পরেই পাকিস্তানি হেলিকপ্টার আমাদের এলাকায় আসে মনে হয়, তারা আবার আসবে। মনে রাখবেন আপনার ব্যাক্তিগত সুবিধার জন্য যেন আমরা অসুবিধায় না পড়ি। মুরুব্বিরা বিদায় হলে চাচা বলেন, "বাবাজিরা হোন হেতারা আইয়া এখখানা অভিযোগ করচে বুজেন্নি, গা গেরামের ব্যাপার বুজেন্নি আন্নারা অ্যার তুন জানগা আল্লাহ ভরসা হেতি যা করেন অ্যাঁয় নো চাই আমার তুন গেরামের ক্ষতি হয়"। তিনি আমাদের উপর ছেড়ে দিলেন যা করার তাই করেন। আমরা চাচাকে বুঝালাম গ্রামের লোক অনেক কিছু বলবে। চারিদিকে সংবাদ নিই কোন দিকে যাবো। ১২মে সকাল থেকে আকাশ অন্ধকার সাথে বৃষ্টি। আমরা সবাই ঘরে বসা, এমন সময় একটা ছেলে সংবাদ দেয় ফেনী দিক থেকে পাক সেনারা আসছে। আপনারা ঘেরা পড়েছেন। সাথে সাথে আমরা বাড়ির সকলকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে গ্রামে চলে যাই। হাটতে হাটতে সিএন্ডবি রোড ক্রস করার সময় আমাদের উপর ফায়ার আসে। আমাদের জানা ছিল সিএন্ডবি রোড মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে। আমরা আওয়াজ করি জয় বাংলা বলে কিন্তু ফায়ার কিছুতেই থামে না। শেষে আমরা সামনে অগ্রসর না হয়ে পিছনে এসে আড় নিয়ে অপেক্ষা করি। কিছুক্ষণ পরেই দূরে আর্টিলারী ফায়ার শুরু হয় ফেনীর দিক থেকে। তখন আমরা নিরাপদ মনে করে যাত্রা শুরু করি। কিছুক্ষণ হাটার পরেই সিএন্ডবি রোড ক্রস করার সময় আমরা ফায়ারের মধ্যে পড়ে যাই। তখন আমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাই। ক্ষুদ্র অস্ত্রের সাথে টু ইঞ্চি মর্টার ফায়ার হচ্ছিলো। এই সময় আমার বাম পায়ে রানে সামনের দিক থেকে আসা গুলিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে পিছন দিয়ে বের হয়ে যায়, সেই সাথে মর্টারের স্প্রিন্টার বা পায়ের গোড়ালী ও পিঠে লাগে। আহত অবস্থা জনগণ ও

আমার সাথীরা আমাকে আমলীঘাট বিওপি তে নেয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা নেওয়ার পর মেজর জিয়ার আদেশক্রমে আমি সহ কয়েকজন আহতকে আগরতলা জিবি (গোবিন্দ বল্লব) ভারতীয় সেনাবাহিনীর গাড়িতে হাসপাতালে পাঠায়। রাত বারোটার দিকে পৌছালে ওটি তে নিয়ে ক্ষতস্থান গুলো পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ করার পর ওয়ার্ড এ নেওয়া হয়। আমরা যে ওয়ার্ড এ ছিলাম সেই ওয়ার্ড স্পেশাল মুক্তিযোদ্ধা ওয়ার্ড নামকরণ করা হয়। জিবি হাসপাতালে একমাস চিকিৎসা নেওয়ার পর ডিসচার্জ করলে ১নং সেক্টর হেড কোয়াটার হরিয়ায় যাই। সেখানে এক সপ্তাহ থাকার পর পুনরায় ক্ষতস্থানে পুঁজ জমে এবং যন্ত্রনা শুরু হলে আগরতলা হেড কোয়াটার বিডিএফ আসি। পরের দিন জিবি হাসপাতালে আউট ডোর রুগী হিসাবে ক্ষতস্থান দেখাই। ডাক্তার ভৌমিক চৌধুরী বলেন যে, দুই দিন পর পর ড্রেসিং করাতে হবে এবং মেডিসিন খেতে হবে। কয়েকবার এইভাবে জিবি হাসপাতালে যাই। ১৫ই মে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী আগরতলা শরনার্থী শিবির পরিদর্শন করতে আসলে ওই দিন তিনি, মুক্তিযোদ্ধা স্পেশাল ওয়ার্ড পরিদর্শন করেন। তিনি প্রতিটি রুগীর সাথে দেখা করেন। প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেশ-বিদেশের গণ্যমান্য ব্যাক্তিরা ছিলেন। এটা তখন ভিডিও হচ্ছিল। হেড কোয়াটার বিডিএফ এর অবস্থা ছিল ৯৩ বিএসএফ হেডকয়াটার এলাকায় (শাল বাগান ও গান্ধী গ্রাম) হেড কোয়াটার বিডিএফ সেনাপতি আতাউল গণি ওসমানী থাকতেন। ওইখানে একটি হাসপাতাল গঠন হয়। বিভিন্ন সেক্টর এর যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে নিহত ও আহতদের আনা হত। বিডিএফ হেড কোয়াটার ট্রানজিট হিসাবে ব্যাবহার হতো। আমরা আহতরা হালকা কাজ করতাম। মাঝে মাঝে খুব ব্যাথা করতো এবং এর ফাঁকেই দুই সপ্তাহ ভারতীয় সেনাবাহিনীর আর্টিলারী রেজিমেন্ট এর, মর্টার প্লাটুনে ৮২ এমএম মর্টার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। এক সময় পায়ের অবস্থা খুবই খারাপ হয়। তখন হেড কোয়াটার বিডিএফ হাসপাতালে ১৮-০৬-১৯৭১ তারিখ হতে ২০-১০-১৯৭১ পর্যন্ত চিকিৎসা নেই। বিডিএফ এডজুটেন্ট রোলকলে বলেন যে, আহত যারা এখানে আছে তারা সকলে যে যার সেক্টর তালিকাই নাম থাকবে। এই আদেশ হবার পর আমি আর সেক্টর হেড কোয়াটারে যাইনি। দেশ স্বাধীন হবার পর জেনারেল উসমানী সহ বিডিএফ হেড কোয়াটার এর সাথে কুমিল্লা হয়ে ঢাকা সেনানিবাসে আসি। কয়দিন থাকার পর আদেশ হয় সবাই এক সপ্তাহের জন্য বাড়ি যেতে পারবে। ঢাকা হতে বাড়ি আসতে তিন দিন সময় লাগে। বাড়ি ফেরার পথে দেখি রাস্তাঘাট, গ্রামগঞ্জ সবকিছুই বিধ্বস্ত। গ্রামে আসলে সবাই দেখতে আসে এবং সবাই জানতে চায় কিভাবে গুলি লাগে এবং কিভাবে আমার চিকিৎসা হয় আমি কোথায় কিভাবে ছিলাম ইত্যাদি। এরপর আমি ২৯ বছর কোর অফ ইঞ্জিনিয়ারস এ চাকুরীর মেয়াদ শেষ করে সিনিয়ার ওয়ারেন্ট অফিসার পদে অবসর গ্রহণ করি।

বীর মুক্তিযোদ্ধা

মো. আব্দুল মমিন সরকার

পরিচালক (অবঃ), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

আমি বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মমিন সরকার। পেশাগত জীবনে আমি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে অবসর গ্রহণ করেছি। আমি মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার আগে একটা পটভূমি রয়েছে। আমি মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তির সংগ্রাম এই দুটোকে আলাদা ভাবে চিহ্নিত করি। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে ১৯৭১ সনের ২৬ শে মার্চ পর্যন্ত ছিল আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। আর ২৬ শে মার্চের পরে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। মোটাদাগে দুইটা অংশ। অনেকে এটাকে মুক্তির সংগ্রাম বলে চালিয়ে দেয়। আসলে আমি মনে করি এবং এটা স্বীকৃত সত্য যে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ মোটদাগে দুই ভাগে বিভক্ত (মুক্তি সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ)। আমি ছাত্রজীবন থেকেই বিশেষত আমি প্রাইমারী স্কুলে যখন লেখাপড়া করি তখনও আমি প্রতিবাদী ছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে হোক আর দূর্ভাগ্যক্রমেই আমার প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক ছিলেন বঙ্গবন্ধুর অন্যতম খুনি কর্ণেল রশিদের পিতা খন্দকার আব্দুল করিম, আমার পাশের গ্রামের বাড়ি। উনি তখন আর্থিকভাবে খুব অস্বচ্ছল ছিলেন। আমাদের এলাকায় মিলাদ পড়ানোর জন্য খন্দকারদেরকে দাওয়াত করা হতো। এজন্য উনি যেদিন দাওয়াত পেতেন সেদিন আর স্কুলে আসতেন না। দাওয়াতের হাদিয়া ছিল চার আনা। এই চার আনা উনার সংসারের জন্য অনেক প্রয়োজন ছিল। উনি উনার দুই ছেলেকে পাঠিয়ে দিতেন। বড় ছেলের নাম ছিল আব্দুল মান্নান ও ছোট ছেলের নাম ছিল আব্দুল রশিদ খন্দকার। যে পরবর্তী সময় ১৯৭৫ সনে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে। উনি যেদিন স্কুলে আসতেননা সেদিন আমাদের খুব ডিস্ট্রাব হতো। আমাদেও পাঁচ ক্লাসে ছিল চার জন শিক্ষক, তার মধ্যে আবার উনি না আসলে লেখা পড়ার অনেক ক্ষতি হতো। আমি যখন ক্লাস ফোরে পড়ি তখন আমার দুই তিন জন সাথীকে নিয়ে স্কুল থেকে চার মাইল হেটে চান্দিনা থানা সদরে গিয়ে থানা পরিদর্শককে খুজে বের করি। এবং তার বিরুদ্ধে

আমি অভিযোগ করি যে, উনি স্কুলে আসেন না। আমার জীবনের প্রতিবাদ শুরুটাই হয়েছে এই অভিযোগের মাধ্যমে। তারপর ১৯৬২ সনে আমি যখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে হাই স্কুলে আসি তখন ছিল ছাত্র আন্দোলন। আমি তখন রাজনীতি বুঝি না, নিতান্তই ছোট ছিলাম। আমাদের কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের নেতৃত্বে কিছু ছাত্রলীগ নেতা আমাদের স্কুলে আসলেন। আমার স্কুলটা হচ্ছে কুমিল্লা জেলার চান্দিনা থানার মাধাইয়া বাজার উচ্চ বিদ্যালয় (ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে)। কলেজের ছাত্র নেত্রীবৃন্দ যখন আমাদের কাছে আসেন এবং আমাদের শিক্ষকদের ও আমাদের উপরের ক্লাসের ভাইদেরকে বললেন যে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়েছে, আমাদেরকে স্ট্রাইক করতে হবে। তখন স্ট্রাইক শব্দটাও বুঝি না। আমাদের ধর্মঘট করতে হবে। তখন ধর্মঘট শব্দের অর্থ বুঝি অগাস্ট মাসের ১৪ তারিখে ছিল পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস। আমি তখন স্কুলে ভর্তি হয়েছি মাত্র ১৭ দিন স্কুলের বয়স। ষষ্ঠ শ্রেণীতে থাকাকালীন সময় স্বাধীনতা দিবসে হাইস্কুল, প্রাইমারী স্কুলের কোনো ছাত্র মিলেও বক্তৃতা দিতে পারে নাই। তখন আমি সাহস করে বক্তৃতা দিতে দাড়িয়ে গেলাম এবং আমার বক্তৃতায় মুগ্ধ হল সবাই। এছাড়াও আমি বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত হলাম। এই সুবাধে ১৯৬২ এর ভাষা আন্দোলনে ছাত্ররা মিটিং করে এবং সেখানে তারা বক্তৃতা দেয় আমিও তাদের কথা শুনে তাদের মতো করে কিছু কথা আমি বললাম এবং এই জীবন শুরু করলাম। এভাবে ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পরলাম। কিন্তু কোন দল এবং কোন দলের কি আদর্শ এগুলা কিছুই বুঝতাম না। পরবর্তী সময়ে আমার জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল যখন ১৯৬৫ সালে যখন ২১ শে ফেব্রুয়ারী তে সারাদেশে শহীদ দিবস পালন হতই না বরং একটা বৈরী পরিবেশ ছিল। তখন আমি আমার স্কুলে ২১শে ফেব্রুয়ারী পালন করি। আমি তখন নবম শ্রেণীর ছাত্র, আমরা তখন সর্বত্র এলাকা প্রদর্শন করি এবং হাইওয়েতে উঠে আমরা মিছিল করলাম। সেখানে সবাই স্লোগান দিচ্ছিলাম রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই, রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই। আমরা স্লোগান দিতে দিতে ঘুরতে ঘুরতে যখন এক পর্যায়ে সমাপ্ত করে এসে স্কুল চত্তরে আবার সমাবেত হয়েছি। তখন আমাদের একজন হুজুর ছিলেন উনি আরবি পড়াতেন। উনি তথাকথিত মোল্লা ছিলেন না, উতি প্রগতিবাদী মানুষ ছিলেন এবং আমাদের স্বাধীনতার পক্ষের একজন মানুষ ছিলেন। উনি এসে আমাদের বলতেছেন যে তোমরা কী স্লোগান দিচ্ছ? এই স্লোগানতো উল্টো হয়ে যাচ্ছে। তো কী উল্টো হচ্ছে? আমরা তখন স্লোগান দিচ্ছিলাম যে, বাংলা ভাষা রাষ্ট্র চাই। এটা আমার জীবনের একটা টার্নিং পয়েন্ট বলা চলে। তখন আমাদের শিক্ষকরা বলল যে স্লোগানতো উল্টো হয়ে গেছে। তখন বয়োঃবৃদ্ধ হুজুর আমাদের শিক্ষকদের থামিয়ে দিয়ে বললেন ঠিক আছে এই ছেলেরা মাছুম বাচ্চা, এদের মুখ দিয়ে যখন বের হয়ে গেছে বাংলা ভাষার রাষ্ট্র

একদিন হতেও পারে। এই বলে সে বলল দে তোরা স্লোগান দে। আমরা আরো দ্বিগুন উৎসাহিত হয়ে ওই বাংলা ভাষা রাষ্ট্র চাই এই স্লোগানটা দিলাম। অবচেতন মনে কেন জানিনা সেদিন আমার মুখ থেকে এই স্লোগান বের হয়ে এসেছিল। যার জন্য ১৯৭১ সনে জীবন বাজি রেখে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করে এই যে ভাষার স্লোগানটাকে দিয়েছিলাম সেটাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম।

তার আগে ১৯৬৪ সনে ফাতেমা জিন্নার ইলেকশন নামে একটি নির্বাচন হয়েছিল। আসলে ১৯৬৫ সনের ২রা জানুয়ারী রবিবার সেই ইলেকশনটা হয়েছিল। আর এটার প্রচারণা হয়েছিল ১৯৬৪ সনে। তখন আমি ক্লাস ৮ এর ছাত্র। আমার স্কুলের শিক্ষক কয়েকজনের সাথে অন্য শিক্ষকরা ফাতেমা জিন্নার পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের বিরোধী দলগুলী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে প্রচার করেছিল। আমরা ছিলাম স্লোগান মাষ্টার। কারন আমরা ছোট বাচ্চা মানুষ, আমরা নেচে নেচে স্লোগান দিতে পারতাম। এজন্য নেতারাও আমাদেরকে বিস্কুট চকলেট দিয়ে আপ্যায়ন করতো এবং আমরা খুব জমাতেও পারতাম। আমরা তখন বুঝে না বুঝে হোক আমরা সেটা করতাম। ১৯৬৬ সনে আমি তখন দশম শ্রেণীর ছাত্র, তখন প্রথম শেখ মুজিবের নাম শুনি স্যারদের কাছে, পত্রপত্রিকাও কিছু পড়ি। একদিন চান্দিনার বিখ্যাত ঐতিহাসিক গরু বাজার যেটাতে সভা সমিতি হতো আগে, সেখানে আসলেন মিজানুর রহমান চৌধুরী, আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক

সম্পাদক এবং আওয়ামীলীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদীকা আমেনা বেগম। আমি কৌতুহল নিয়ে মিটিং শোনার জন্য গেলাম। চার মাইল হেটে তাদের মিটিংয়ে গেলাম তাদের বক্তৃতা শুনলাম এবং আমারও ইচ্ছা জাগলো যে আমিও কিছু কথা বলব। কারণ এর আগেই আমি এটি রপ্ত করে ফেলেছি এবং এটি আমার অভ্যাস হয়ে উঠেছে। আমি সুযোগ পেয়ে গেলাম। আমি ছোট মানুষ আমি হাফ প্যান্ট পরে গেছি। সেখানে তারা আমাকে একটি টুলের উপর দাড় করিয়ে দিলেন। সেখানে মানুষ লোকে লোকারণ্য ছিল এবং আমার মতো একজন ক্ষুদে বক্তা যখন দাড়িয়ে গেছি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তখন মানুষ আরো হুমড়ি খেয়ে মানুষ চারদিক থেকে এসে কয়েকগুন হয়ে গেল। এবং জ্বালাময়ী একটা বক্তৃতা দিলাম। বুঝে হোক আর না বুঝে হোক নেতাদের কথা অনুমান করে ১৯৬৬ সনে খুব জ্বালময়ী একটা বক্তৃতা দিলাম। নেতাদের এবং মানুষের ভালোবাসায় সেদিন আমি শিক্ত হয়েছিলাম। পরদিন স্কুলে আসছি ১১ টায় ক্লাস। আমরা একটু সকালেই আসছি। পথের পাশের দোকানদার আমাকে বললো তুমি স্কুলে যেও না। আমি বললাম কি ব্যাপার? সে জানালো স্কুলে পুলিশ আসছে, তুমি কালকে কোথায় কি বক্তৃতা দিয়েছ সে জন্য পুলিশ আসছে। আমি আর স্কুলে না গিয়ে স্কুল থেকে একটু দূরে রইরলাম। পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম যে স্কুলে পুলিশ আসছে আমার গতকাল রাষ্ট্র বিরোধী ও সরকার বিরোধী বক্তব্যের জন্য এবং আমার বিরুদ্ধে হুলিয়া হয়েছে। তখন হুলিয়া শব্দ বুঝি না। আমার প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রথান শিক্ষক ছিলেন একটু প্রগতিশীল মানুষ এবং স্বাধীনতাকামী মানুষ। তারা পুলিশকে পাচঁ টাকা দিয়ে খুশি করেন, যেটা ঘুষ সুজা কথায়, তাদেরকে পাচঁ টাকা দিয়ে বিদায় করে দিলেন। তখন পুলিশ যাওয়ার পর আমি স্কুলে গেলাম। আমার শিক্ষকরা আমাকে জিজ্ঞেস করলো না, কিন্তু দেখলাম যে না উনারা খুব গর্বিত আমাদের জন্যে। উনারা বললো যে তুই কি বক্তৃতা দেও, কথা এভাবে বলতে হবে ওইভাবে বলতে হবে, উনারা আমাকে দিক নির্দেশনা দিলেন। আমি খুব আপ্লুত হলাম এবং আমার সাহসটা খুব বেড়ে গেল যে উনারা ও আমার এই কর্মকান্ডে খুব খুশি হয়েছে। আমি ভেবেছিলাম যে উনার হয়তো আমাকে শাসন করবে কিন্তু তারা শাসন না করে তারা আমাকে সোহাগ করলেন। তখন আমি বললাম, স্যার আমি তো রাষ্ট্র বিরোধী বক্তৃতা দেয়নি, আমি সরকার বিরোধী বক্তৃতা দিয়েছি। রাষ্ট্রবিরোধীতা আর সরকার বিরোধীতা এক জিনিস নয়। তখন আমার কয়েকজন স্যার আমাকে আদর করে বুকে নিয়ে আমার যুক্তিটাকে মেনে নিলেন এবং তারা এটাকে খুব ভালেভাবেই দেখলেন। তারপর কলেজে চলে গেলাম। আমার একটা জিনিস ছিল যে তখন আমাদের এলাকায় ছাত্রলীগের কোনো শাখা ছিল না। আমি নিজ উদ্যোগে রীতিনীতি মেনে ছাত্রলীগ এর একটি শাখা তৈরি করেছি। আমার জানামতে আমার জেলায় আর কোনো কমিটি ছিলনা

এবং তখন থেকেই আমি ছাত্রলীগরে রাজনীতি ও শেখ মুজিবের রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করলাম। ১৯৬৬ সনে বঙ্গবন্ধু সাড়া ফেলেন একটি জনসভায় সেখানে আমিও গেলাম ওনার বক্তৃতা শুনার জন্য। গিয়ে দেখলাম লোকে লোকারণ্য। উনার বক্তৃতা শুনে মানুষ পুতুলের মতো নাচতেছিল। সবচেয়ে বেশি যে জিনিস ছিল তার জনসভায় দুজন লোক কবি ছিলেন। একজন হলো সন্ধীপের সফি এবং আরেকজন মোহাম্মদ শাহাজান আলী যিনি স্বাধীন বাংলা বেতারের গান পরিবেষক। বক্তৃতা চলাকালীন অডিয়েন্স থেকে কে যেন উনাকে প্রশ্ন করলো আপনি আয়ুব খানকে ভয় পান না? উনি হাসতে হাসতে জবাব দিলেন-শ্বায়রে শ্বয়ন যার কিসেরই কী ভয় তার। তার এই জবাবে তুমুল করতালিতে মানুষ উচ্ছাসিত হয়ে কয়েক সেকেন্ড বোধহয় মানুষ এই করতালির মধ্যেই ছিল। তখন হুট করে সফি বাঙালি দাড়িয়ে গেল মাইকের সামনে গান ধরলো তোরা সব জয়ধ্বনী কর আয়ুবের আতংক মোদের এই মুজিবর। আমরা তো তখন দশম শ্রেণীর ছাত্র আর আমরা আনন্দিত হয়ে খুব লাফালাফি করলাম। এবং সেদিনই স্থীর করলাম যে এই লোকটাই হবে আমার নেতা। জীবনে যদি রাজনীতি করি অথবা সংগ্রাম করি তাহলে ওনার আদর্শেই করবো। তারপর ১৯৬৭ সনে আমি এসএসসি পাস করে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি হলাম। কিন্তু আমার পরিবার থেকে সবসময় একটা বাধা ছিল। আমি অতি শৈশবে পৃত্রিহারা হই। পিতা জীবিত থাকতেই আমার নানা আমাকে নিয়ে এসেছিলেন তার সংসারে। আমি নানা বাড়িতে থেকে মামাদের সহযোগীতায় লেখাপড়া করেছি। আমার মামাদের পক্ষথেকে একটা শর্ত ছিল যে তোমার লেখাপড়া করাবো আমরা, যতটুকু করতে চাও করতে পারো কিন্তু তুমি রাজনীতি করতে পারবা না, রাজনীতি করলে লেখাপড়া তোমার বন্ধ। কলেজে গেলাম তবে রাজনীতির নেশাতো রক্তে মিশে আছে। আমি একটা ঘরোয়া মিটিংয়ে বক্তব্য রাখলাম। পরের দিন সেটা আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আজাদ পত্রিকায় যখন প্রকাশিত হলো তখন আমার ছোট মামা চাকরী করতেন তৎকালীন সিলেটে, তিনি আজাদ পত্রিকায় খবরটি দেখে (পত্রিকায় লেখা হলো আমি কুমিল্লা জেলা ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক) পুরা পত্রিকাটা একটা খামের ভিতর মুড়ে আমার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেন এই তোমার প্রতিশ্রুতি। তুমি বলেছিলে যে রাজনীতি করবেনা। আমি পরে লেখাপড়ার খরচ বন্ধ হয়ে যাবে চিন্তা করে কোনো সংগঠনে আর নাম লিখাতাম না কিন্তু ভিতরে ভিতরে কাজ করতাম তবে শুধু কাজ না নেতৃত্ব ও দিয়েছি। ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুথান ছিল আমার জীবনের আরেকটি টার্নিং পয়েন্ট। ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুথানে আমি আমার এলাকায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করলাম এবং একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠন করলাম। আমি এটার প্রধান দায়িত্ব নিলাম। তখন একটা স্লোগান ছিল জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো, এটাকে আমাদের

এলাকার কিছু অতি উৎসাহী বা বামপন্থী লোকজন অন্যরকম ভাবে উপস্থাপন করে। তখন বিডি মেম্বারদের বাড়িতে আগুন লাগাতে শুরু করল। এবং যারা সামাজিক ভাবে দুঃচরিত্র, চোর, ডাকাত এমনকি আমার বাড়ির পাশের এক অবস্থাসম্পন্ন ভদ্রলোকের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিল। তার অপরাধ হলো সে সুধখোর। পরে এগুলি আমি কঠিন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছি। ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুথানের সময় চান্দিনাতে বিশ হাজার মানুষের একটা মিছিল করেছিলাম। আমার হাইস্কুল এলাকা মাধাইয়া থেকে চান্দিনা শহরে চার মাইল হেটে গেলাম এবং চার পাশের মানুষ এসে আমার সাথে জড়ো হলে আমি সেদিন সেই ঐতিহাসিক মিছিল করেছিলাম। তখন জননেতা তোফায়েল আহমেদ ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুথানের মহানায়ক। উনিও একদিন চান্দিনায় একটি জনসভা করেছিলেন এবং বক্তব্য রেখেছিলেন, এছাড়া পরবর্তীতে নূরে আলম সিদ্দিকী যার বক্তৃতা যেন কবিতা আবৃতি করছে, এতো সুন্দর বক্তব্য দিয়েছিলেন। তাদের সান্নিধ্য আমি পেয়েছিলাম এবং ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুথানে সেই বিশাল মিছিলের নেতৃত্ব দেওয়ার ও সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এর পরেই শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু হলেন। তিনি বঙ্গবন্ধু হওয়ার পরে ১৯৭০ এর নির্বাচন আসলো। এই নির্বাচনে একজন কলেজ ছাত্র হিসাবে তখন আমি অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। নির্বাচন পরিচালনার যে কমিটি সেটার সর্বকনিষ্ঠ সদস্য হলাম ছাত্রলীগের প্রতিনিধি হিসাবে। আমি জাতীয় পরিষদের ও প্রাদেশিক নির্বাচেনে আমার জেলার সিনিয়ন বড় ভাইদের সাথে একত্রে কাজ করেছি। আমার এলাকায় আমি যথেষ্ঠ ভূমিকা রেখেছি। এবং মানুষের একটা আস্থা ছিল আমার প্রতি যা আমি খুব গর্ব করেই বলি যে আমি আমার জীবনে সর্বক্ষেত্রে প্রমান করেছি সেটা হলো সততা, এটাই আমাকে এগিয়ে দিয়েছে। আমি চিরদিন সৎ থাকার চেষ্ঠা করেছি এবং সৎ ছিলাম। একটা ঐতিহাসিক ঘটনা হলো, তারিখটা আমার মনে নেই রোজার দিন ছিল তখন আমাদের দেবীদ্বার থানা সদরের নিয়াজ উদ্দিন পাইলট হাই স্কুলের মাঠে একটি নির্বাচনি জনসভা হলো। সেই জনসভায় বক্তব্য রাখলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। উনি দুপুরের দিকে আসার কথা কিন্তু উনি আসতে আসতে বিকাল হয়ে গেল। উনি এসেই মঞ্চে যখন উঠলেন সেখানে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। উনাকে করতালি এবং উৎফুল্ল জনতা অভিনন্দন জানাতে গিয়ে স্কুলের বোর্ডিং ছিল টিনের চালের সেটা ধ্বসে মানুষ সব নিচে পরে গেল। এবং গাছে যে লোক গুলি ছিল তারাও অনেকে নিচে পড়ল। তবে বেশি একটা আহত হয় নাই। উনি এসে বলল যে রোযার দিন আমি সিলেট থেকে রওনা দিয়ে ১৯টা মিটিং করেছি,া আপনারা আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দেন। মিটিংটা পরিচালনা করতেছিলাম আমি, উনি আমাকে সামনে এগোতে বললেন যে তুই কিছু বল আমি একটু রেষ্ট নেই। বলেই তিনি একটা সোফায় বসলেন কিন্তু মানুষ কেউ কারো কথা শুনতেছে

না। কারন একটা জিনিসিই দেখেছি যে বঙ্গবন্ধুর মিটিংয়ে অন্য কারো বক্তব্য শোনার মন মানসিকতা কারোই ছিল না। উনি এই অবস্থা দেখতে পেয়ে আমাকে পিছনে টান দিয়ে মাইকটা সামনের দিকে নিয়ে আসলেন। আমি উনার পিছনে দাড়িয়ে গেলাম আর উনি বক্তৃতা দিলেন। খুব বেশি কথা বললেন না সামান্য কয়েকটা কথা শুধু মানুষের সাথে ভাব বিনিময় করার মতো। আমার একটা কথা এখনো মনে আছে উনি বলেছিলেন যে আপনারা বঞ্চিত ও শোষিত বাঙালি, আপনারা আমকে ভোট দেন আপনাদের ২৪ বছরের পাওনা আমি সুদে আসলে ফিরিয়ে দিব। এটা ছিল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি অধ্যাপক মোজাফ্ফর আলীর এলাকা তো উনি সেদিন সেখানে ছিলেন। একজন প্রশ্ন করলো এখানে ন্যাপ প্রধান আছে। তখন উনি জবাব দিরেন, হ্যাঁ আমি জানি এখানে আমার বন্ধু আছে। উনি আমার বন্ধু, আমি বলেছি তাকে যে সাইনবোর্ডটা নামিয়ে আসো, চল একসাথে রাজনীতি করি। তোমার রাজনীতি আর আমার রাজনীতি মানুষের জন্যই তো করি। এই কথাটা সাধারণ মানুষ আবার ভুল বোঝল। সেখানে আরেকজন প্রশ্ন করলো যে আপনি জয় বাংলা বলেন কেন? উনি হাসতে হাসতে বললেন যে ঠিক আছে তাহলে আমি কী ক্ষয় বাংলা বলব। সবাই এই কথা শুনে তাকে করতালি দিয়ে উৎসাহিত করলেন। উনি বললেন যে আপনারা নৌকা মার্কায় ভোট দিবেন। আমি আপনাদের অধিকার আদায় করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ। আবার দেখা হবে দোয়া চেয়ে উনি মঞ্চ থেকে নেমে আমার পিঠের মধ্যে দুই তিন বার চাপ দিয়ে একটা হস্ত স্পর্শ দিলেন। এই যে আমার জীবনের একটা সৌভাগ্য তার মতো একটা মানুষের হস্ত স্পর্শ পাওয়া, আদও পাওয়া এবং উনি আমার হাত ধরে মঞ্চ থেকে নামলেন। উনাকে বিদায় দিলাম এটা ও আরেকটা ঘটনা। ১৯৭০ এর নির্বাচন হয়ে গেল, আমার প্রার্থী ছিলেন দেবীদ্বার এবং চান্দিনা মিলে সেখান পাশ করলেন অবসর প্রাপ্ত ক্যাপ্টেন সুজাত আলী। উনি রাজনীতিতে তখন নবাগত ছিলেন। তিনি আওয়ামীলীগের প্রার্থী হয়ে নৌকা মার্কায় পাশ করলেন। তার পরের ইতিহাস তো সবাই জানি আমরা। নির্বাচনের পরে মার্চ মাস আসলো প্রকৃত পক্ষে পহেলা মার্চে ঢাকা স্টেডিয়ামে খেলা হচ্ছিল পাকিস্তান বনাম ওয়েস্টেন্ডিজ। তখনই ঘোষনা হলো যে ০৩ তারিখে নির্বাচন হবে না। তখন সমস্ত বাঙালিরা রাস্তায় নেমে আসলো। আমি ছিলাম কুমিল্লা শহরে। আমরা তখন ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্র এবং কলেজে ক্লাস করি আবার বিকাল বেলা মিছিল ও করি। এই করতে করতে ০৭ তারিখে বঙ্গবন্ধু ভাষন দিবেন আমরা কুমিল্লা টাউন হলে বসে আসি। কিন্তু আমরা সেদিন আর ভাষনটা শুনতে পারিনি। আমাদের মধ্যে একটা উৎকণ্ঠা চারদিকে আর গুজব কী হয়েছে না হয়েছে কিছুই বুঝতে পারছি না। খুব সংক্ষিপ্তভাবে প্রচার করলো আর বঙ্গবন্ধুর ভাষনের সামান্য একটু শুনালো। তারপর রাত্রে আমার আকাশবানী কলকাতার খবর শুনে কিছুটা ধারণা

পেলাম কিন্তু আমরা পুরাপুরি ধারনা পেলাম না। পরদিন সকাল ৮টা ৫ মিনিটে রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্র থেকে তার রেকর্ডকৃত ভাষণটা প্রচার করা হলো। ভাষণটা প্রচার করার সাথে সাথে কুমিল্লা শহরে মানুষের যে জাগরণ এবং রাস্তায় নেমে আসার যে স্রোত দেখলাম সেটা জীবনে কোনো দিন ভুলব না। আমিও সেদিন সিদ্ধান্ত নিলাম যে বঙ্গবন্ধু সেদিন বলেছিলেন যে আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি এ কথাটাকে মনে রেখে যে তোমরা ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল এবং তোমরা প্রস্তুতি নাও। আমি তার এই কথায় যা বোঝার বুঝে ফেললাম এবং কুমিল্লা শহর ছেড়ে তাৎক্ষনিক আমি আমার এলাকায় চলে আসলাম। এসে একটা সংগ্রাম পরিষদ করলাম। আমি এটা আহবায়ক হয়ে স্থানীয় আওয়ামীলীগ সমর্থকদের নিয়ে এটা গঠিত করলাম। এখানে কিছু আনসার সদস্য ছিল যারা আওয়ামীলীগ সমর্থন করতো। পরবর্তী সময়ে একজন আমার আত্মীয় ছিল আমার নানা শশুর। উনি ইউনিয়ন কাউন্সিলের মেম্বার ও আওয়ামীলীগের সভাপতি ছিলেন এবং নিবেদিত প্রাণ একজন আওয়ামীলীগার ছিলেন। উনি আবার আনসার কমান্ডারও ছিলেন। উনাকে প্রস্তাব করলাম তার নেতৃত্বে আন্দোলন করার জন্য, উনি সরল মনের ছিলেন তাই বললেন যে আন্দোলনের নেতৃত্ব তুইই দিবি আর তোদের ট্রেইনিংয়ের ব্যবস্থা আমি করে দিব। আমি প্রায় ১০০ জন যুবক ছাত্র নিয়ে একটা ট্রেইনিংয়ের ব্যবস্থা করলাম। ট্রেইনিংয়ের জন্য আরেকজন সেনাবাহিনীর সদস্য ছিলেন (আব্দুল জব্বার)। উনি আমার মামার সম বয়সি ছিলেন। আরও একজিন ছিল, তারা ট্রেইনংয়ের ব্যবস্থাটা নিলেন। আমরা ফিজিক্যাল ট্রেইনিং দেওয়া শুরু করলাম। পরে বাশের লাঠি বন্ধুকের সাইজ করে, তারা থিওরেটিক্যাল ট্রেইনিং এর ব্যবস্থা করলো। কেননা তখন তো আমরা প্র্যাকটিক্যাল ভাবে ব্যবহার করতে পারছি না। আমরা ট্রেইনিং দেওয়া শুরু করলাম ও ২৫ শে মার্চ সন্ধ্যা পর্যন্ত করলাম। ট্রেইনিং করার পরে ২৬শে মার্চ সকাল থেকে দেখি যে রেডিও বন্ধ কোনো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। কোনো খবর নাই কোথায় কি হইছে কোনো কিছুই যানি না। সন্ধ্যা সময় রেডিওতে ইয়াহিয়া খানের ভাষন শুনলাম। যখন সে বলল যে শেখ মুজিব একজন দেশদ্রোহী, সে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে। তখন এই রেডিওর ভাষনটা বন্ধ করে দিয়ে লোকজন চিৎকার দিয়ে প্রতিবাদে ফেটে পরল। আমাকে সবাই মাথায় নিয়ে বলা শুরু করলো যে না আর কোনো আপোষ নেই। এখন কি করবা কর, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তখন ট্রেইনিং সেন্টারটা ছিল মহাসড়কের পাশে, আমার মামা এই সেন্টারটিকে আরো দুই মাইল ভিতরে আমাদের প্রাইমারী স্কুলের পাশে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। এইদিকে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, এরপর আমরা দুই-একদিন ট্রেইনিংয়ে গেলাম কিন্তু পরবর্তীতে আর ট্রেইনিং হল না। এর ভিতরে ঢাকা থেকে দলে দলে মহাসড়ক দিয়ে গ্রামের দিকে লোক আসতেছে। আমরা যারা ট্রেইনিং

করেছিলাম তাদেরকে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে রুপান্তরিত করলাম। ঢাকা থেকে পলায়নরত মানুষদের থাকা খাওয়া সহ তাদের যত রকমের সহযোগীতা লাগে সব করলাম। ক্ষুদার্ত মানুষের খাওয়ার ব্যবস্থা করলাম। এর পরে ময়নামতি সেনানিবাস আমার খুব কাছে। এখান থেকে কিছু সৈন্য পালিয়ে আসলেন। ২৭ তারিখে তাদের সাথে দেখা হলো তারা বললেন যে ঢাকা ক্যান্টনম্যান্টে আক্রমনের সাথে সাথেই কুমিল্লাতেও আক্রমণ করা হয়েছে। এবং আমার হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক তখন বদলী হয়ে ইস্পাহানী স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। উনাকে কোথায় ধরে নিয়ে গেছে কোথাও খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। স্বাধীনতার পরেও তাকে কোথাও পাওয়া যায় নাই। তার কোথায় কবর হয়েছে তা আজও যানি না। তিনি স্বাধীনতার প্রথম প্রহরেই স্বাধীনতার জন্য উনার জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। আমরা এগুলি শুনে মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছি। ট্রেইনিং নেওয়ার জন্য কোথায় যাব, মুক্তিযুদ্ধের জন্য কোথায় যাব আমরা কিছুই জানতে পারছি না। আকাশবানী এবং বিবিসির খবরটা ছিল আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি মুল্যবান। তখন জানতে পারলাম যে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে, ভারতের কোথায় কোথায় ট্রেইনিং হচ্ছে। এর মধ্যে জানতে পারলাম ১০ই এপ্রিল বিপ্লবী সরকার গঠিত হয়েছে। ১৭ই এপ্রিল তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলার বর্তমান মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলার আম্র কাননে (আম বাগানের মধ্যে) গঠন করা হলো অস্থায়ী সরকারের রাজধানী এর নামকরণ করা হলো মুজিবনগর সরকার। সেখানে তারা শপথ গ্রহণ করেন, আমরা রেডিওর মাধ্যমে জানতে পারলাম। এটা শুনে খুব উদ্বুদ্ধ হলাম। সম্ভবত এর এক দুই দিন পরেই আমার এলাকার মধ্যে আমি যেখানে ট্রেইনিং করছিলাম, আমার প্রাইমারী স্কুলের পাশেই এক বাড়িতে মিলিটারি ডুকল। ওরা হুড খোলা জীপের মধ্যে এলএমজি তাক করে যখন তখন যাকে ইচ্ছা গুলি করতো পাখির মতো। একদিন এসে বাড়িতে ঢুকে গেলো। আমরা যখন মিলিটারি গাড়ির আওয়াজ পেতাম তখন দৌড়াদৌড়ি করে নিরাপদ জায়গায় পালিয়ে যেতাম। আমার পরিবারসহ অন্যান্য পরিবারের মুরুব্বিরা গাড়ির আওয়াজ পাইলেই দৌড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেত। ওইদিন আমরা বরাবরের মতো গাড়ির ও গুলাগুলির আওয়াজ শুনে নিরাপদ জায়গায় চলে গেলাম। আমরা দূর থেকে লক্ষ রাখতেছি যে কোন বাড়িতে ঢুকে। দেখলাম আমার স্কুলের পাশেই এক বাড়িতে ঢুকেছে। কিছুক্ষণ থাকার পরেই তারা আবার চলে গেল। আমরা কিছু দুরে থেকেই তাদের আচরণগুলি লক্ষ করতেছিলাম। লোকমুখে খবর পেলাম যে তারা চলে গেছে। পরে আসলাম ওই বাড়িতে, ওই বাড়িতে এসে দেখি যে একজন গৃহবধু যার ছেলে আমার এক বছরের সিনিয়ার সে এসএসসি পাশ করার পরে একটা প্রাইমারী স্কুলে নতুন মাষ্টারি করতেছে। এই ভদ্র মহিলা ছিলেন সম্পর্কে আমার খালা এবং আমাকে খুব আদর করতেন। আমার এই খালা ছিলেন অতন্ত সুন্দুরী, তখন উনি

মধ্য বয়স্ক ছিলেন। মিলিটারিরা যেয়ে উনাকে লাঞ্ছিত করার জন্য উদ্ধত হলো। আমার খালু/উনার স্বামী ও এই ঘরেই ছিলেন। সবাই পালিয়ে গেলেও ওনারা পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায় নাই। পাকিস্তানি সৈন্যরা ওনার উপর চড়াও হওয়ার চেষ্টা করলো তখন উনার স্বামী প্রাণপণে বাধা দিল এবং অনেক দস্তাদস্তি হলো। এতে পাকিস্তানি সৈন্যরা তাদের হীন লালসার চরিতাত্র করতে পারে নাই। তারা ব্যর্থ হলো। এই মহিলার স্বামীকে এবং মহিলাকে ওরা রাইফেল দিয়ে জখম করলো। কিন্তু তার চরিত্র হনন করতে পারলো না। ফলে তারা তাদের নাস্তানাবোধ অবস্থায় ফেলে রেখে চলে গেল। আমরা ফিরে আসলাম এবং আমার সাথে যারা ট্রেইনিং করেছিল তারা সবাই বলল, না আর আমরা মেনে নিব না, আমরা যুদ্ধে যাবো, এই ব্যবস্থা তোমাকে করতে হবে। তুমি কি করবা জানিনা আমরা আর একদিনও ঘরে থাকতে রাজি না। কি করবো বুঝতে পারতেছিলাম না, সেটা ছিল দুপুরের ঘটনা তাদের বললাম যে বিকালে তোমরা স্কুলের মাঠে আসো। বিকেলে আমরা মাঠে উপস্থিত হলাম এবং স্কুলের পেছনে একটু বসলাম। এর আগেই দুপুরের ঘটনার পর আমি বাসায় যাব খাওয়া দাওয়া করতে এর মধ্যে রাস্তার মাঝে দেখা হলো একজন লোকের সাথে, তার নাম রফিকুল ইসলাম কাজল। সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের একজন সক্রিয় কর্মী। সে আমাকে বলল রেজা ভাই ভারতের সোনামোড়ায় আছে। সোনামোড়া হচ্ছে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের একটা মহকুমা শহর যেটা আমাদের কুমিল্লা শহর থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে। সে আমাকে খবর দিল রেজা ভাই ওখানে ক্যাম্প করেছে, সেখানে উনি তোকে যাইতে বলছে। রেজা ভাই হলো সৈয়দ রেজাউর রহমান উনি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি ছিলেন। প্রখ্যাত একজন ছাত্রনেতা বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন। বর্তমানে উনি একজন আইনজীবী ও বার কাউন্সিলরের সভাপতি এবং ১০ বার উনি নির্বাচিত হয়েছেন। উনার এই খবরটা পেয়ে আমি বিকাল বেলা সবাইকে ডাকলাম। আমি খবর পাইছি, আমরা সোনমোড়া যাব। এর মধ্যে কাকতালীয় ভাবে একটা ঘটনা ঘটল, আমার পাশের গ্রামে আমার মামীর বড় ভাই সুফী নুরুল হক সরকার, বাড়ি উত্তর কৃষ্ণপুর চান্দিনা থানায়। সে ও তার ছোট ভাই শহিদুল্লাহ এসে হাজির। তিনি আমার এক বছরের সিনিয়ার ভিক্টোরিয়া কলেজের। সে আমাকে বলল যে আমি এই মাত্র ইন্ডিয়া থেকে আসছি দেশ থেকে মুক্তিবাহিনী নেওয়ার জন্য। তাই আমি বললাম যে তাহলে আমাদেরকে নিয়া চলেন এবং তখন তিনি তাৎক্ষণিকভাবে রাজি হয়ে গেলেন। তিনি আর বাড়িতে গেলেন না, তা বাড়ি ছিল আরো চার থেকে পাঁচ মাইল দূরে। তিনি বললেন তোমরা রেডি? আমি বললাম যে হ্যা আমরা রেডি আছি। তারপর উনি গিয়ে আমাদের বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করলেন, আমি সবাইকে বললাম তোমরা যারা যারা যাবে তারা সবাই আস। আমরা সন্ধ্যার সময়

আবার স্কুলের মাঠে একত্রিত হলাম। হওয়ার পরে বললাম যে যারা অল্প বয়সের এবং যারা সংসারের কর্তা ব্যক্তি যাদের না হইলে সংসার চলবে না এই ধরনের লোক আর বয়স্ক ব্যক্তি তোমরা কেউ আসবা না। যারা আমরা ট্রেইনিং করেছি শুধু তারাই আসো। রাতের বেলা বেশি আলো ও জ্বালাইতে পারি না। সবাইকে একত্রিত করে নিয়ে আমরা চললাম। এক ভদ্র হিন্দু ডাক্তার আমাদের বাড়িতে থাকতেন যুদ্ধকালীন সময় আশ্রয়ের জন্য, উনি নিজের হাতে সেলাই করে দুইটা কাপড়ের ব্যাগ বানাইছেন। তখন উনি আমাদের বাড়িতে ছিলেন না। আমি গোপনে তার থেকে একটা ব্যাগ চুরি করে ওই ব্যাগের ভিতরে একটা টিনের থালা, একটা টিনের মগ আর লুঙ্গি নিয়া রওনা দিলাম। নানির বাড়িতে থাকতাম সেখানে কাউকে কিছু বলি নাই। নানিকেও বলি নাই, কিছু না বলেই ঘর থেকে আস্তে করে বের হয়ে চলে আসছি এবং এটা আমার অভ্যাসের মতো ছিল, বিভিন্ন জায়গায় মিছিল মিটিং করেছি। নানি এসে আস্তে করে খাবার রেখে যেতেন, আমি গিয়ে রাতে খেতাম। তারা মনে করেছে যে আমার সেই চিরচারিত অভ্যাস, তাই আমি হয়তো কোথাও গিয়েছি। আমি তো চলে গিয়েছি ওই একটা লুঙ্গি নিয়েছি তখন যে আমরা দুইটা কাপড় নিব সেরকম দুইটা কাপড় আমাদের ছিল না। আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা এমন ছিল যে দুইটা জামা একসাথে পরতে পারিনি। স্যান্ডেল পরে কলেজে গেছি। হাইস্কুল জীবনে আর স্যান্ডেল পড়তে পারি নাই। একটা জামার ও একটা গেঞ্জির বেশি ছিল না। হাইওয়ে দিয়ে যাওয়া যায় না গ্রামের পথ দিয়ে ঢুকলাম। যাওয়ার পথে একটা ঘটনা ঘটল, একটা বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছি, আমার সাথে যে বন্ধু ছিল, সেখানে আমার ক্লাসমেট ছিল দুই জন। তো এরা এই বাড়ি টা চিনতো, তখন তারা বলতেছে এটাতো মবিনের ঘর। মানে এটা ছিল আমার জন্ম স্থান। ওই ঘরের মধ্যে আমার মা, বড় ভাই আর আমার ছোট বোনটা শুয়ে আছে। বিদ্যুৎ বিহীন এলাকা তখন, সন্ধ্যার পরেই ঘুটঘুটে অন্ধকার। আমি তাদেরকে থামিয়ে দিলাম। যে আমি আমার ঘরের পাশ দিয়েই যাচ্ছি কিন্ত আমি আমার মাকে আমি জাগাইলাম না। জাগাইলামনা এই কারনে যে সে যদি জানতে পারে, সে মা হিসেবে মাতৃ স্নেহের খাতিরে আমাকে বাধা দিতে পারে। আমি হইতো দূর্বল হয়ে যেতে পারি সেজন্য আমি মাকে জানাইলাম না। এজন্য আমাকে অনেক বন্ধু বান্ধব বলতো যে তুই খুব কঠিন মানুষ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কঠিন হতে হয়। আমি গেলাম সারারাত হাটলাম। পথে বুড়িচং থানার বাড়াল্লাতে একটি দরবার শরীফ আছে ওখানে গেলাম তখন গভরি রাত্র। ওইখানে গিয়ে ঘাটলায় ওযু করে দরবার শরীফে দুই রাকা'ত নফল নামায পড়লাম। পড়ার পরে আমাদের যে গাইড, যিনি আমাদের নিয়ে যাচ্ছিলেন, সুফি নুরু মামা উনি একটা মোনাজাত করেছিলেন সেই নিশিত রাত্রের স্তব্ধতা ভেদ করে আহাজারিতে আমার মনে হয় আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কেপে গিয়েছিল। আমরা

নির্যাতিত আমরা মজলুম তুমি মজলুমের সহায়তাকারী। তারপর আমরা সেখান থেকে বের হয়ে বুড়িচং থানার কংশনগর খেয়াঘাট থেকে নৌকা দিয়ে গোমতী নদী পাড়ি দেই। তার কিছুক্ষণ পরেই রেল লাইন পার হই। ২রা মার্চের পর থেকে রেল লাইন দিয়ে রেল চলতো না, একটা মরা সাপের মতো পড়ে আছে রেল লাইনটা। সেই রেল লাইন অতিক্রম করে আমরা যখন বর্ডারে পৌছালাম, ত্রিপুরা রাজ্যের সোনামোড়া মহকুমার একটা জায়গায়। যখন দেখলাম সীমান্ত পিলার তখন সবাইকে লাইন ধরে দাড় করালাম এবং দাড় করিয়ে সবাইকে বললাম যে সবাই এক মুঠ করে মাটি নাও। সবাই এক মুঠ মাটি নেওয়ার পরে হাত প্রসারিত করে। আমি বললাম যে আমার সাথে সবাই প্রতিজ্ঞা করো, প্রতিজ্ঞা করলাম, দেশ মাতৃকার মুক্তির জন্য দেশের স্বাধীনতার জন্য আমরা ঘর থেকে বের হয়েছি। এই দেশ স্বাধীন না করে আমরা কেউ ঘরে ফিরব না। জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বলে শপথ নিলাম এবং সবাইকে থামিয়ে দিলাম। তারপর আমি আবার বললাম, আরেকটা কথা আছে। আমাদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধে যদি কেউ আমরা শহীদ হই, তাহলে যদি সম্ভব হয় একে অপরের মৃত দেহটা যেন বাংলার মাটিতে কবর দেওয়ার সেই ব্যবস্থাটা করি। তখন সবার চোঁখ দিয়ে পানি চলে আসছিল। আমরা ভারতে ঢুকলাম। তখন সেখানে একটা ট্রানজিট ক্যাম্প করেছে, শরনার্থী মুক্তিযোদ্ধা যারা যাচ্ছে তাদের সেবা করার জন্য। ক্যাম্পের অনেকেরই ঘুম ভাঙ্গে নাই। দুই একজন যারা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য উঠছে তাদের জিজ্ঞাস করলাম, তারা বলল যে না এখানে কোনো ট্রেইনিংয়ের ব্যবস্থা নাই। আমরা অপেক্ষা না করে সোনামোড়ায় রেজা ভাই এর উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম তাও আবার পায়ে হেটে। এর মধ্যে কিছু দূর যাওয়ার পরে দেখি একটা ৫০ সিসি মটর সাইকেলে করে দুইজন আরোহী আসতেছে। আরোহীরা এসে আমার সামনে দাড়ালো তখন দেখলাম যে পিছনে রেজা ভাই বসা আর সামনে যে চালাচ্ছে তাকে তখনও আমি চিনি না। পরে অবশ্য উনার পরিচয় পেয়েছি। রেজা ভাইকে দেখেই আমি সালাম দিলাম। সালাম দেওয়ার পর উনি জিজ্ঞাস করলো এলাকার কী অবস্থা। আমি বললাম যা জানি এবং তাকে বললাম ভাই আমরা যুদ্ধের জন্য এসেছি, আমরা কোথায় যাব এখন। উনি আমাকে একটু আলাদা ভাবে ডেকে আমাকে একটা চিরকুট লিখে দিলেন। গোপাল চৌকিদারের বাড়ি, হাসপাতাল রোড জেলখানার উত্তর পার্শে চিরকুটে শুধু এতটুকুই লিখা ছিল। দিয়ে সে বলল যে তুই যা আমি আসতেছি। আমি বললাম যে আমার সাথে যারা এসেছে তারা কি করবে। তিনি বললেন না তাদের নেওয়া যাবে না, শুধু তুই যাবি। অন্য জায়গায় ট্রেইনিং এর ব্যবস্থা করবো তাদের, তাছাড়া এখন আর কিছু করা যাবে না, তুই সেখানে চলে যা। আমি একটা মহা চিন্তায় পড়ে গেলাম এবং রাতে তো গুনতে পারি নি শেষে দেখলাম ৭০ জনের মতো হয়ে গেছে, ছোট

ছোট বাচ্চারাও গেছে। এইট নাইন এ পড়ে এমন বাচ্চাও আছে। সারারাত্র ভয়ে দৌরত্য রক্ষা করে চলেছে। সকাল হওয়ার পরেতো তাদেরকে দেখে আমি অবাক যে তোরার মা বাপের কাছে কী জবাব দিব আমি। পরে তারা বলল যে, তোমার যেহেতু একটা ব্যবস্থা হয়েছে তাহলে তুমি আগে যাও। যেহেতু তোমার একটা ব্যবস্থা হয়েছে পরে আমাদেরও একটা হবে। তাদের থেকে বিদায় নিয়ে আমি সোনামোড়া গেলাম রেজা ভায়ের সেই ঠিকানা অনুযায়ী। গিয়া দেখলাম যে ৭/৮ হাত একটা দুচালা টিনের ঘর। তখনাকর সময় এটার ভাড়া ছিল ১৫ টাকা। এটাকে করা হয়েছে মুজিব বাহিনী এবং পরবর্তী সময়ে যে বিএলএফ বাহিনী হয়েছে তার রিক্রুটিং সেন্টার এবং ট্রানজিট ক্যাম্প এবং স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের হেড অফিস, এই ছোট্ট দুচালা টিনের ঘর। তাও একটা টিলার উপর। সেখানে গিয়ে পরিচিত কাওকে পেলাম না। তখন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্র সংসদের যে ভিপি ছিল নাজমুল হাসান পাখি, সাধারণ সম্পাদক রুস্তম আলী। তারা আমার ক্লাসমেট সেখানে তাদের কাউকে পাইলাম না। তারা কোথায় আছে জানি না, সেখানে মোঘল টুলির একটা লোক নাম কাশেম, সে সেখানে রান্না বান্না করে। আমিও তার সাথে রান্নার কাজে একটু সহযোগিতা করলাম। সন্ধ্যার সময় রেজা ভাই এসে বলল যে আগামীকাল একটা দল আগড়তলায় যাবে। এই বলে একটা লিস্ট দিল, সেই লিস্টে দুই নাম্বারেই আমার নাম টা ছিল। আমি চিন্তা কলাম যে আগড়তলায় যাব ঠিক আছে কিন্তু এই ছেলে গুলোকে যে নিয়ে আসলাম এরা কোথায় যাবে কী করবে। আমি উনাকে একটু অনুরোধ করলাম যে আমাকে একটু পরে দেন। আমি তাদেরকে একটু দেশে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি। তিনি তেমন কিছু একটা বললেন না, পরবর্তীতে আমি রান্না যে করে ওই কাসেমকে বললাম যে তুমি রেজা ভাইকে একটু বুঝিয়ে বইল আমি তাদেরকে একটু দিয়ে আসি। ওই দিনই পরবর্তী সময়ে ট্রেইনিংয়ের ব্যবস্থা হলে তাদের এই কথা বলে ওই নুরু মামার সাথেই চলে আসছি এবং তারা সহি সালামতেই ফিরে আসছে কোনো অসুবিধা হয়নি। তাদেরকে সহি সালামতে পৌছে দিয়ে আমি আবার ভারতে চলে গেলাম। সোনামোড়া গেলাম তখন রেজা ভাই আমাকে বলে যে, তোর তো বেশ সাহস আছে দেখা যায়। তোর একটু সাংগঠনিক কাজ করতে হবে, তোকে দেশে আবার যেতে হবে। বিএলএফ এ মুক্তিযুদ্ধা রিক্রুটমেন্টের একটা পলিসি ছিল যে একবারে খাঁটি আওয়ামীলীগ, ছাত্রলীগ এবং কমপক্ষে ইন্টারমিডিয়েট পাশ হতে হবে। এর নিচে আর কাউকে নেওয়া হবে না। ছাত্রলীগের লোকদের সংগ্রহ করার জন্য এবং সাংগঠনিক কিছু কাজ দিয়ে আমাকে দেশে পাঠাইল। সাংগঠনিক কাজে আমাকে পাঁচ-ছয় বার দেশে আসতে হয়েছে এবং প্রতিবারই বিপদের মুখে পড়তে হইছে। জীবনের ঝুকি নিয়ে আমাকে আসা যাওয়া করতে হয়েছে। সর্বশেষ চান্দিনা থানা এবং

বরুড়া থানার মুজিববাহীনির একটি আঞ্চলিক কমান্ড, তাদেরকে ইন্ডাকশন(প্রবেশ করানোর) দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হলো। এটা জুলাই মাসের ১৯ তারিখ আমার স্পষ্ট মনে আছে আমরা আগড়তলা বর্ডারে যখন আসছি একটা মিলিটারি লরিতে করে তখন ঠিক সন্ধ্যা। আমার সাথে তখন চান্দিনার একজন মেডিকেলের ছাত্র ড. সিরাজুল ইসলাম সেও আমার সহযোগী হইল। বর্ডারে এসে যখন প্রবেশ করব তখন এখানের দলপতি ছিল বরুড়ার আবুল কালাম আজাদ। তার কী হলো সে যাবে না, কেন? সে জঙ্গলের মধ্যে একটা কাপড় মুড়ি দিয়ে কাপতেছে। প্রচন্ড জ্বর তো সে যাইতে পারবে না। তাকে বাদ দেওয়া হলো। তখন দলপতি বানানো হলো চান্দিনা থানার কলইন গ্রামের মহিউদ্দিন মিয়াকে। উনি আমার দুই বছরের সিনিয়র ছিলেন। উনাকে দলপতি করার পর সিদ্ধান্ত নিল যে ৯ জনই যাবে। এর মধ্যে আবার দেখা গেল যে, আরেকজন নাই কী ব্যাপার। সে হলো কুমিল্লার প্রখ্যাত ছাত্র নেতা এবং বাংলাদেশের মানচিত্রের রচিয়তা শিব নারায়ণ দাস। সেও এই দলে যাওয়ার কথা কিন্তু হঠাৎ করে সে বলতেছে যে আমার রাইফেলটা হাড়িয়ে গেছে। এই জঙ্গলে আর টর্চ লাইট জ্বালতে পারতেছি না আর সেই রাইফেল আর খুজে পাওয়া সম্ভব না। রেজা ভাই আর তার সাথে ছিল মাঈনুল হুদা (আমাদের কুমিল্লা জেলা মুজিব বাহিনীর সেকন্ড ই কমান্ড) ওরা হাসতেছে কিন্তু আমি বুঝতে পারতেছি না। এদের একজনের জ্বর আরেকজনের রাইফেল পাই না ঘটনাটা কি। তখন আমারে মাঈনুল বলল যে ইডি হইল পাকনা! এরা যুদ্ধে যাইব না এরা উছিলা ধরছে, তুই ইডি বুঝবি না। আসলে দেখলাম তাই, আমরা বাকি ৮ জন, আমি আর সিরাজ এই ১০ জন রওনা দিলাম। গোমতি নদী পার হলাম। ক্ষরস্রোতা নদী তখন অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। গুমতি নদী পার হয়ে কুমিল্লা সিলেট হাইওয়ে পার হয়ে রামপুরে তাদেরকে একটা আঁখ ক্ষেতের ভিতর রেখে আমি আর সিরাজ রাস্তায় গেলাম রেকি(দেখার) করতে। গিয়ে দেখলাম যে উত্তর দিক থেকে দুইটা মিলিটারি গাড়ি আসতেছে। মিলিটারি গাড়ি বুঝলাম এই কারনে যে পেছনের গাড়ির লাইটে বুঝা গেছে সামনের টা মিলিটারির গাড়ি। এটা দেখে তাড়াতাড়ি করে গিয়ে একটা ছোট একতলা মসজিদ ছিল সেই মসজিদের মধ্যে আশ্রয় নিলাম। মিলিটারিরা চলে গেল, তবে সেখানে মসজিদের উপরেই বাংকার করা ছিল। সেখানে রাজাকাররা পাহাড়া দিত। রাজাকাররা তখন নিচেই ছিল, মিলিটারির গাড়ি গুলো চলে যাওয়ার পর রাজাকাররা একটু পাশের একটা চায়ের দোকানে গিয়ে দোকানদারকে ঘুম থেকে জাগিয়ে চা টা খাচ্ছিল। অপর দিকে আমি আঁখ খেতের দিকে তাকিয়ে ইশারা করার পর আমের সাথের লোকজন বেরিয়ে রাস্তা পার হল। রাস্তা পার হয়ে একটু ডানে বুড়িচং থানার ভাড়েল্লা গ্রামে যাকে স্থানীয়ভাবে বলা হয় সুবারামপুর। ওখানে গেলাম সেখানে আব্দুল মালেক নামের এক ভদ্র লোক

একজন স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতা উনাকে আগে থেকেই খবর দেওয়া ছিল, যখন এই দলটা আসবে উনি যেন আশ্রয় দেয়। উনার বাড়িতে আশ্রয় দিলেন। এদিকে উনার ছোট ভাই আমার ক্লাসমেট, আগড়তলায় আমার সাথেই মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে(কলেজ টিলায়) ছিল। সকালে উনার বাড়িতে উঠলাম আমরা যাওয়ার পর পরই দেখলাম যে পিছনে গুলাগুলি হচ্ছে। পরে জানলাম খেয়া নৌকার মাঝিটাকে ওরা গুলি করে মেরে ফেলেছে। দুপুরে উনার বাড়িতে একটা বাঁশ ঝাড় ছিল এবং পাশে একটা পাট ক্ষেত ছিল ওখানে অস্ত্র শস্ত্র গুলি রেখে আমরা দিনটা কাটালাম সেখানে। এরপরে দেবীদ্বার থানার ফলতলি থেকে দুইটা ডিঙ্গি নৌকা নিলাম, নৌকা গুলি নিয়ে আমরা দেবীদ্বারের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। এখানে ডিঙ্গি নৌকার মাঝিরা যেতে চাচ্ছিল না। তখন আমরা তাদেরকে বললাম যে আমরা বরযাত্রি এবং তাদের অন্যন্য লোভ দেখালাম। তখন ডিঙ্গি নৌকা ছিল আভিজাত্যের ব্যপার অন্যান্য নৌকা থেকে এর ভাড়া একটু বেশি ছিল। আমরা বরযাত্রি হিসাবে যাবো সেখানে ভালো খাবার দিবে সেজন্য ও বেশি ভাড়ার লোভে তারা রাজি হয়ে গেল। আমার সন্ধ্যা বেলা যখন নৌকাতে উঠতে যাচ্ছি তখন তারা একটু ভিমড়ি খেয়ে বললো যে না আমরা যাবো না। তখন আমার বন্ধু তাদের একটু ধমক দিল, আমরা যেহেতু প্রকাশ্যে এসে গেছি যে আমরা মুক্তিযুদ্ধা তাদেরকে ছাড়াও যাবে না। তখন তাদেরকে একটু ধমক দেওয়া হলো যে হয় নৌকা ছাড় না হয় গুলি করবো, তখন তারা ভয়ে নৌকা ছাড়লো। সাড়া রাত্র নৌকা বেয়ে মাধাইয়ার ব্রিজের নিচে চলে গেছি ভুলে। এর মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটেছে, ব্রিজ তখন পাহাড়া দিচ্ছিলি রাজাকাররা এঠছাড়া মিলিটারিরা ও ছিল সেখানে। আমরা ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে প্রায় ব্রিজের নিচে চলে গিয়েছিলাম। তারা কিছুক্ষণ পরপরই অনর্থক গুলি করে মানুষকে জানান দেয় যে তারা সজাগ আছে। একটা গুলি আমার মাথার উপর দিয়ে সাই করে চলে যায়, তখন আমি নৌকার সামনে ছিলাম। আমি তো হতাশ হয়ে তখন নৌকা থামাইলাম। মাঝিদেরও দেখলাম যে তাদেরও গায়ের শক্তি কমে গেছে। যাই হোক পরে নৌকাটা ভিরাইলাম। সেই জায়গাটা আমার খুব পরিচিত জায়গা। দেখলাম যে সর্বনাশ হয়ে গেছে আর দশ গজ গেলেই নৌকাটা ব্রিজের নিচে চলে যেত। তাড়াতাড়ি করে দুইটা নৌকা ঘুরিয়ে একটু দূরে গিয়ে এক বাড়িতে উঠলাম। বাড়ির কর্তা একজন সাধারণ গৃহস্থ মানুষ। যদিও তাদের কথা ইতিহাসে কোনো দিনও লিখা থাকবে না। সে যা করেছে, আমাদের সে শুধু আশ্রয়ই দেয় নাই। আমাদের নিরাপত্তার জন্য সে যা করেছে, তাদের কথা যখন ভাবি তখন মনে হয় তাদরে জন্য জীবনে কী করতে পারলাম। ভাবলে চোখের পানি চলে আসে। এরপর আবার আরেক বিপদে পরলাম, সেটা হলো খাদঘর নামক এক জায়গায় গিয়ে মেইন রোড পার হতে হবে। সেখানেও একটা ব্রিজ পার হলাম। উপর দিয়ে

মিলিটারি গাড়ি যাচ্ছে, এখন ফিরতেও পারতেছি না আবার যাইতেও পারতেছি না। তখন সাহস করে নৌকা দুইটা ব্রিজের নিচে ঢুকিয়ে দিলাম কারন মিলিটারি গাড়ি গুলো ব্রিজের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে কিন্তু ব্রিজের নিচে কি আছে সেটাতো আর তারা দেখতে পায় নাই। আসলে বিপদের সময় বুদ্ধি হারা হইলে হয় না। ডিউটিরত রাজাকাররাও তখন তাদের বসদেরকে সালাম দিয়ে দাড়িয়ে রয়েছে নিচে কিন্তু তারা কেউই খেয়াল করে নাই। মিলিটারি প্রায় ৭-৮ টা গাড়ি যখন চলে গেল তখন ভয়ে থড়থড় করে কাঁপছি। আমাদের দুইটা নৌকায় দুজন মাত্র লোক সশস্ত্র অবস্থায় আর বাকি সবাই ব্রিজের অনেক দূর দিয়ে হেটে এগিয়ে গেছি। গাড়িগুলো চলে যাওয়ার পরে আমরা গিয়ে নৌকায় উঠলাম। উঠে চান্দিনা থানার সর্ব দক্ষিন এলাকার কালিয়ারচর বাজার নামে একাটা বাজার আছে ওখানে গেলাম তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ওখানে গিয়ে আটা রুটি কিনলাম আর আখের গুড়। সারাদিন আমরা উপবাস। তাছাড়া যে ভদ্রলোক আমাদের আশ্রয় দিয়েছিল তার গ্রামের নাম ঘোড়ারপাশ আর তার নাম করিম বেপারী। উনার বাড়িতে আমাদের ভালো খাওয়া দাওয়া করায়ছিল এজন্য আমাদের কোনো অসুবিধা হয়নি। সন্ধ্যার সময় আমাদের ক্ষিধা লাগছে তো আমরা মুড়ি, রুটি আর গুড় কিনলাম। এবার আমরা কোথায় থাকব সে চিন্তা। সেখানে স্থানীয় যে আমাদের আশ্রয় দেওয়ার কথা ছিল তাকে আর খুজেঁ পেলাম না। উনি ছিলেন জনাব ইউসুফ তখন তিনি ঢাকা কলেজের প্রফেসর ছিলেন। পরে অত্র এলাকা আমার অনেক পরিচিত ছিল কেননা আমি ১৯৬৬ থেকে রাজনীতি করি সে সুবাধে পরে কঙ্গাই নামক এক এলাকায় একটা পরিত্যাক্ত হিন্দু বাড়িতে গিয়ে রাত্রিটা রইলাম। পরদিন সকালে রসুলপুর নামক একটা জায়গায় এই ৮ জনের বাহিনীটাকে রেখে আমি আবার আগড়তলা চলে গেলাম। আমি ৫-৬ বার যত বারই আশা যাওয়া করেছি চান্দিনা থানার প্রত্যেকটা নেতাকে আমি নিয়ে গিয়েছি। আমি সেখানে গেলাম ২৭ তারিখ। পরবর্তীতে আবার একটা গ্রুপকে ইন্ডেকশনের জন্য আমাকে বলা হলো। তখন আমরা থাকতাম আগড়তলায় একটা গ্লাস ফ্যাক্টরিতে। সেখানে শেখ ফজলুল হক মনি (পূর্বাঞ্চলীয় মুজিব বাহিনীর অধিনায়ক)'র ক্যাম্প ছিল। একটা তাবুর মধ্যে ছিল উনার হেডকোয়াটার। পাশে পরিত্যাক্ত একটা টিনশেড, এটার মধ্যে ছিল আমাদের ট্রানজিট ক্যাম্প। তো ২৭ তারিখ ডাকল আমাকে যে আরেকটা গ্রুপকে নিয়ে যেতে হবে। আমি বললাম আমি কেন যাব, তখন সবাই বলাবলি করতেছি যে, আমি খুব সাহসি। এই জিনিসটা তাদের মধ্যে একটা ধারণা হয়ে গেছে। আর তার মধ্যে প্রমাণ হয়ে গেছে। তখন আমি চিন্তা করে দেখলাম যে এত সাহস দেখানো মনে হয় ভালো না। আমি রেজা ভাইয়ের নির্দেশে চান্দিনা থানার ভিতরে ও ঢুকে গেছিলাম খোজ খবর নিতে। সেখানেও আমি বেক্কলের অভিনয় করে আমি বেঁচে আসছি। তারপর আমি বললাম যে না

আমি যাব না আমি এবার ট্রেইনিংয়ে যাব এবং আমি যুদ্ধ করব। আমি বললাম যে আমার পরিচয় কি? তখন শেখ ফজলুল করিম সেলিম বর্তমানে যিনি আওয়ামীলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য এবং সাবেক মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় সেলিম ভাই নিজের হাতে লিখলেন যে আব্দুল মুমিন সরকার মুক্তবাহিনীর একজন সদস্য, তিনি মুক্তিযোদ্ধের একজন বিশেষ সংগঠক এবং মুক্তিযুদ্ধের কাজে তাকে নিয়োজিত করা হলো। তার চলার পথে সবার সহযোগীতা কামনা করছি। ধন্যবাদান্তে আব্দুল কুদ্দুস মাখন একটা সিল মেরে সিলটার মধ্যে লিখলেন আব্দুল কুদ্দুস মাখন(সাধারণ সম্পাদক) আর বাম পাশে লিখলেন সেলিম। সেটা ছিল ২৭-০৭-১৯৭১ এটা আমার জীবনের একটা প্রথম সার্টিফিকেট পাইলাম। আমি বললাম যে সার্টিফিকেট পাইছি ভাল কথা কিন্তু আমি ট্রেইনিংয়ে যাব। তখন ৮০ জন করে একটা গ্রুপ করা হতো ট্রেইনিংয়ের জন্যে। অগাস্টের ০১ তারিখ একটা গ্রুপ যাবে ট্রেইনিংয়ের জন্যে আমি ধরলাম যে আমাকে এই গ্রুপে দিতে হবে। তখন আব্দুল কুদ্দুস মাখন ছিল স্বাধীন বাংলা সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক। উনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন আর বাই দিছ টাইম উনি আমার সাহসিকতার কথা শুনে উনি রেজা ভাইকে বললেন (রেজা ভাই ছিলেন পূর্বাঞ্চল কমান্ডের ইন্ডাকশনের দায়িত্বে এবং মুজিব বাহিনীর স্টুডেন্ট লিয়াজু অফিসার)। তখন একটা সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পত্রিকা বের হতো। আব্দুল মান্নান চৌধুরী যিনি বর্তমানে ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির ভিসি। উনার সম্পদনায় এই পত্রিকাটা হতো। এটার প্রকাশনার দায়িত্বে আমি ছিলাম। আমি সুন্দর হেডিং লিখতে পারতাম। উনি বললেন যে ওরে পত্রিকাটায় ও দরকার আবার প্রেসে যাওয়া ও দরকার। আমি বললাম যে আমি কোনোটাতেই যাব না আমি ট্রেইনিংয়ে যাব। তখন মাখন ভাই আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে এই বলে তিনি আমার নামটা দিলেন। আমাদের ১ তারিখে যাওয়ার কথা ছিল। এর আগে যত গুলো গ্রুপ গিয়েছে তাদেরকে আমি আগড়তলা থেকে কার্গো বিমানে আমি উঠিয়ে দিয়েছি। বিমানে জীবনে প্রথমে উঠছি, উঠে দেখি বিমানে সবাই ত্রির্পালের মধ্যে বসে আছে। তখন আমি বললাম এটা আবার কী বিমান। তখন কার্গো বিমান আর যাত্রী বিমান এতটুকু বুঝি না। আমাদের ১ তারিখে যাওয়ার কথা, বিএসএফের গ্রীন সিগনেল না পাওয়ায় যেখানে আমাদের নিরাপত্তার অভাব বোধ করাতে যাওয়া পিছিয়ে গেল। মোট তিন দিন পিছালো ৪ তারিখে গিয়ে আমরা রওনা দিলাম। দুইটা গাড়ি আসলো সেখানে দুইটা গাড়িতে ৪০ জন করে উঠল এবং ওইখানে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে যে আমাদের গ্রুপ লিডার কে হবে। তখন মাখন ভাই সবাইকে ব্রীফ করল এবং আমার হাত ধরে উঠিয়ে বলল, হি ইজ ইউর গ্রুপ লিড়ার। তখন কড়তালি দিয়ে অভ্যর্থনা জানালো এবং আমাকে একটা লড়ির সামনের সিট দিয়ে দিল পরে সবাই গাড়িতে উঠল। সবাই গাড়িতে

উঠার পরে আমাকে একটু ডেকে নিল, তখন আমরা কলেজ টিলায় থাকতাম। আগড়তলায় নির্মীয়মাণ দুইটা চারতলা পরিত্যাক্ত ভবন। সেখানে ডেকে নিয়ে আমাকে জন প্রতি ১০০ করে টাকা দিল। ৮০ জনের জন্য মোট ৮,০০০ টাকা দিয়ে বলল যে প্রত্যেককে তাদের পকেট খরচের জন্য এই টাকাটা দিয়ে দিবি। গ্রুপ লিডার হিসাবে আমি সই করলাম এবং টাকা গুলো নিয়ে গাড়িতে উঠলাম। কিছু দূরে যাওয়ার পরে আমার মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন জাগল যে অন্যসব গ্রুপ তো এয়ারপোর্টে কিন্তু এতক্ষণ হয়ে গেল এয়ারপোর্ট কী এত দূরে নাকি। আমাদের সাথে ০২ জন করে ভারতীয় সদস্য ছিল তাদেরকে জিজ্ঞাসা করি কিন্তু এরা কিছু বলে না। এরা শুধু বলে চুপ করে থাকো এবং আমাদের অনুসরণ কর। পরে গাড়ি গিয়ে থামলো ধর্মনগর রেল স্টেশনে। এর ভিতরে উচু নিচু পাহাড়ি রাস্তার মধ্যে এক এক জনে বমি করে খুব খারাপ অবস্থা। পথে মাঝে মাঝে গাড়ি থামিয়ে মাথার মধ্যে পানি দিয়ে তাদের সেবা ও করতে হইছে। সন্ধ্যা সময় ধর্মনগর পৌঁছালাম। সেখানে একটা রেল আসলো নির্ধারিত দুইটা বগিতে আমাদেরকে উঠতে বললো এবং আমরা উঠলাম। এর পর ওখান থেকে গেলাম করিমগঞ্জ। করিমগঞ্জ জংশনে গিয়ে আমরা নামলাম এবং সেখানে গাইডাররা আমাদেরকে একটা হোটেলে নিয়ে গেল। সেখানে পূর্ব নির্ধারিত করা হোটেলে আমাদের নিয়ে গিয়ে ভালো খাবার দাবার খাওয়ালো। খাওয়া দাওয়ার পর যার যার টাকাটা আমি দিয়ে দিলাম। যারা বিড়ি টিরি খায় তাদের পার্সোনাল খরচের জন্য। এরপর তারা আমাদেরকে বলল যে এই প্লাটফর্মেই বিছনা বিছাইয়া আমাদের থাকতে হবে। আমরা এই রাত্রটা করিমগঞ্জ থাকলাম। পরদিন সকাল বেলা একটা ট্রেইন আসল এবং নিদিষ্ট দুইটা বগি ছিল, আমরা সেখানে উঠলাম। উঠার পর সারাদিন ট্রেইন চলল এবং অনেক বড় বড় সুড়ঙ্গ মানে জীবনে কখনও দেখি নাই। অবাক হয়ে গেলাম যে বিশাল বড় পর্বত এর ভিতর দিয়া ট্রেইন যাচ্ছে। প্রথমে কিছুটা ভয় পাইলাম পরে আবার আনন্দ ও করলাম। বিকাল বেলা ট্রেইন এক জায়গায় থামল। কোথায় থামল আমরা কিছু জানি না। কারন আমাদের দরজা বন্ধ আর আমরা স্লোগানও দিতে পারতেছিনা কিছুই করতে পারছি না। তারা আমাদেরকে বলল যে তোমরা কথাবার্তা একটু কম বলবা। ওখানে নামলাম কোথায় নামছি কিছু যানি না। রেল স্টেশনে যে পরিচিতি বোর্ডটা থাকে সেখানে দেখলাম লেখা লোয়ার হাফলং। নেমে ওখান থেকে ১০ মিনিটের পথ হাটলাম। হেটে একটি পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে উঠলাম। দেখি যে একটা সেনানিবাস, আমাদেরকে একটা বেরাকের মতো ঘরে নিয়ে গেল দুই সারিতে ৪০ জন করে চৌকি পাতা। সেখানে বিছনাপাতি আছে কম্বল আছে বালিশ আছে। আর প্রত্যেকের সাথে একটা করে টেবিল আছে, টেবিলের সাথে একটা করে গ্লাস আছে খাওয়ার প্লেট আছে জগ আছে। ওইখানে আমাদের বলল যে তোমরা যার

যেভাবে শুয়ে রেস্ট নাও সন্ধ্যার পরে তোমাদের সাথে কথা হবে। সন্ধ্যার পর এক ভদ্র লোক আসলেন এবং এসে কিছু বক্তৃতা দিলেন। দেওয়ার পরে সবাইকে একটা করে কমলা দিলেন এবং এক প্যাকেট বিস্কুট দিলেন। দিয়ে আমাদেরকে আপ্যায়ন করলেন। এর পর বলল যে তোমাদেরকে ৪২ দিন এখানে থাকতে এবং ট্রেইনিং করতে হবে। আমরা সেখানে ট্রেইনিংয়ে থাকার মধ্যে আমাদের ট্রেইনিংটা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। একটা হলো আমাদের তাত্ত্বিক ক্লাস করতে হয়েছে রাজনৈতিক ক্লাস করতে হয়েছে এবং আমাদেরকে পরিষ্কার ধারণা দেওয়া হয়েছিল যে এই যুদ্ধ যদি দীর্ঘায়িত হয় তাহলে মানুষকে কীভাবে উৎসাহিত করে মানুষের মনোবল ঠিক রাখা যায়। পরে আমাদেরকে বলা হলো যে এটা গেরিলা যুদ্ধ জনগণ হচ্ছে পানি আর গেরিলারা হচ্ছে মাছ। এই ছিল আমাদের ট্রেইনিং। সেখানে খুব সুন্দর ভাবে সমাজতন্ত্র কি, গণতন্ত্র কি এগুলির উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সেখানে আমাদের ট্রেইনিংয়ের মাঝামাঝি অথবা শেষের দিকে আমাদের ট্রেইনিং পরিদর্শন করার জন্য গেলেন আমাদের মুজিব বাহিনীর চার অধিনায়কের মধ্যে দুই অধিনায়ক জননেতা আব্দুর রাজ্জাক সাহেব(বর্তমানে প্রয়াত) ও সিরাজুল আলম সাহেব। রাজ্জাক ভাই অত্যন্ত সুন্দর ভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় সাংগঠনিক বক্তৃতা দিলেন। আর বক্তব্য দিতে উঠেই বললেন যে কেই হাতে তালি দিতে পারবা না। উনার ৩২ মিনিটি বক্তৃতার মধ্যে আমার মনে হয় ৩৩ বার হাত তালি হইছে। উনার একটাই কথা ছিল যে যদি কোনো কারনে মুক্তিযুদ্ধ দির্ঘায়ীত হয় তাহলে আমাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে ও যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে এবং আমাদের বিজয় অর্জন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের ফিরার কোনো পথ নেই। জীবন থাক আর যাক। আর এই মুক্তিযুদ্ধে আমাদের দেশে বামপন্থী দলগুলি (চায়না পন্থী, রাশিয়াপন্থী) তারাও অংশ গ্রহণ করেছে। তারা চাইবে তাদের কমিওনিজম প্রচার করার জন্য কিন্তু আমাদের মতবাদ হচ্ছে মুজিববাদ। এটা হলো সিরাজুল আলম খানের বক্তব্য। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপ্রেক্ষতা আর জাতীয়তাবাদ। এটা হচ্ছে বঙ্গকন্ধুর দর্শন এর বাইরে আমরা কখনও যাবনা। এটা প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাদের যা করা লাগে তাই করতে হবে। এবং এই শপথ নিয়া আমাদের কাজ করতে হবে। আমার কোনো আপোষ করতে পারব না এবং করা যাবে না। বঙ্গবন্ধু ফিরে আসবে কী আসবে সেটা আমরা জানি না তবে বঙ্গবন্ধুই আমাদের নেতা, আর কোনো নেতাকে আমরা মানি না। উনি খুব কঠিন ভাবে এই কথা গুলি বললেন যে বঙ্গবন্ধুকে ছাড়া অর কেউ যেন অন্য কোনো চিন্তা না করে। তো আমরা সেখানে খুব উচ্চতর ট্রেইনিং নিলাম এবং আমরা খুব প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র পেলাম। আমাদের থাকা খাওয়ার জন্য অনেক টাকা দেওয়া হলো, কারন আমাদের কে জনগণ যদি খাওয়ায় ভালো কথা কিন্ত জোড় করে কারো কাছ থেকে খাইতে পারবোনা। কারো উপর অত্যাচার করতো পারবোনা, কোনো

চাঁদাবাজি করতে পারবোনা। প্রয়োজন হলে উপাস থাকবো, যে টাকা দিয়েছে সেই টাকা যদি ফুরিয়ে যায় তাহলে আরো টাকা দেওয়া হবে কিন্তু কারো প্রতি জুলুম করতে পারবোনা, কারো মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কিছু করতে পারবোনা। আমি ট্রেইনিং থেকে ঘুরে আসলাম এবং আগড়তলা গ্লাস ফ্যাক্টরীতে রইলাম। তখন আমাদের থানা থেকে মাত্র ৫ জন মুজিব বাহিনীর ট্রেইন্ড। এর মধ্যে আমরা তিন জন মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারছি আর বাকি দুইজন যুদ্ধের পরে আসছে। তারা টেইন্ড কিন্তু যুদ্ধ করার সুযোগ পায় নাই। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার এক সিনিয়র, আমরা একই স্কুল থেকে লেখাপড়া করছি, তার বাড়ি হচ্ছে নোয়াগাঁও আর আমার বাড়ি হচ্ছে তোলাগাঁও। উনি ছিলেন মুজিব বাহিনীর অধিনায়ক ও থানা কমান্ডার। উনার নাম ছিল হাবিবুর রহমান ভূইয়া। উনি এমএ ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র ছিলেন, তখন তার পরীক্ষাও হয়েগেছে। আমি সারা জীবন সেখানে রাজনীতি করেছি, বড় হয়েছি, সেজন্য সে বলল যে দেবিদ্বারে আমার কোনো লোকজন নাই তাই মবিনকে আমার সাথে দিতে হবে। আমার ডাক নাম ছিল মবিন পরবর্তী সময় এটা পরিবর্তন হইয়া রেজিষ্ট্রেশনে নাম হইছে মুমিন সরাকর। আমি এখনো মবিন নামে অনেকের কাছে পরিচিত। তো আমি বললাম যে আমি তো দেবিদ্বার চিনি না। আমার এলাকার ৬টা ইউনিয়ন চিনি বাকিগুলা চিনি না। যাক উনার কথায় আমি আসলাম। এসে আমাদের একটা কাজ ছিল মুক্তিযোদ্ধা তৈরি করা। স্থানীয় ভাবে মানুষকে মটিভেট করে ট্রিইনিং দিয়ে তৈরি করা। করতে এসে দেখলাম যে আমাদের এলাকাটা ছিল অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদের এলাকা। যে কারনে ওই ন্যাপের প্রভাবটা বেশি ছিল। ছাত্র ইউনিয়ন মতিয়া গ্রুপটা বেশি ছিল। এরা ছিল তাত্ত্বিক, এরা আমাদের ছাত্রলীগের মতো এতো ডেডিক্যাডেট ছিল না। এরা মানুষদের কাছে তাত্ত্বিক বক্তৃতা দিত যে এই যুদ্ধ শুরু হইছে এটা কয় বছরে শেষে হবে কে জানে। ভিয়েতনামের অবস্থা দেখেন না আপনারা। মানুষকে তারা এভাবে বিভ্রান্ত করতো। তাদেরকে মিটিং ডেকে তাদেরকে বোঝাতাম কিন্তু তারা মানুষকে কুতর্ক করতো। সেখানে ক্যাপ্টেন সুজাত আলী উনি নিজেও মুক্তিযুদ্ধ করছে। বাংলাদেশে উনি একমাত্র এমএলএ যিনি প্রত্যক্ষ মুক্তিযোদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে এবং খালেদ মোশারফের সাথে উনি আহতও হইছেন। বুকের মধ্যে স্প্রিন্টার নিয়ে উনি ত্রিপুরার পালাটানায় নিজে একটা ট্রেইনিং সেন্টার খুলেছিলেন। পরবর্তীতে উনার একটা সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম, উনি বলেছেন যে ৭,৭৩৫ জন মুক্তিযুদ্ধা উনার ওখানে তৈরি হয়েছে এবং ত্রিপুরার সরকারের অনুদান ছাড়াও তৎকালীন সময়ে নিজের তহবিল থেকে ২৭,০০,০০০ টাকা উনার অনুদান ছিল। উনার এটা আমি রেকর্ড করে রেখেছি। ওখানে বেশরিভাগই ছাত্রলীগ আর আওয়ামীলীগের সমর্থকরাই গিয়েছিল। ন্যাপের হাতেগুনা কয়েকজন ট্রেইনিং করেছে আসামের

তেজপুরে। যাই হোক প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র নিয়ে দেশে ফিরলাম। অস্ত্র গুলা আমার এক ক্লাসমিটের বাড়িতে রাখলাম। ও তখন ঠাট্টা করে বলতেছিল যে ওরে বাবারে এতো অস্ত্র, প্রায় দুই ঢোল অস্ত্র। ঢোল মানে আমাদের দেশে ধান রাখে। এটা নিয়ে স্বাধীনতার পরেও আমাদের সাথে রশিকতা করতেন। অস্ত্র শস্ত্র এনে যারা এফএফ এর কিছু কম অশিক্ষিত ছেলে ছিল তাদেরকে মোটিভেটেড করলাম কিন্তু তাদের অস্ত্র নাই ওই তিন জন চারজন মিলে একটা রাইফেল, ১০টা বুলেট, ০২টা গ্রানেট এই ধরনের ছিল। আমি দুই তিনজন প্ল্যাটুন কমান্ডার আমার বন্ধু মানুষ তাদেরকে মোটিভেটেড করে তাদেরকে বললাম যে তোমরা আমাদের সাথে কাজ করো। আমার কাছে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র আছে এবং তাদেরকে অস্ত্র দিলামও। তারাও আমাদের সাথে জয়েন করলো এবং আমরা এক সাথে প্রস্তুতি নিলাম কিন্তু ন্যাপ গ্যারিলা কি? আমি চোঁখে নাই। আমি চান্দিনাতে তিনটা সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। চান্দিনাতে ১২০০ পাকিস্তানী বাহিনী আত্মসমর্পন করে। আমরা দুই দিন তাদেরকে ঘেরাও করে রেখেছিলাম কিন্ত তারা মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ করলো না। কারণ তাদের একটা ভয় ছিল এবং যেটা বাস্তব ছিল যে মুক্তিযুদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পন করলে তারা জেনেভা যুদ্ধনীতি বুঝে না আর তারা মানবে ও না। এই ছেলেদের হাতে তাদের জীবন নিরাপদ না। তখন আমরা যারা মুজব বাহিনীর ছিলাম তাদের সাথে পরামর্শ করলাম। ওরা বলল যে হ্যা তোমরা মুজিব বাহিনীর কয়জন আছ। আমরা বরলাম যে আমরা তোমাদের সম্পূর্ণ নিরাপত্তা দিব। তারা বলল যে তোমরা তো সংখায় কম, আসলেই আমরা সংখায় কম ছিলাম আর সাধারণ এফএফ বাহিনী ছিল তারা একটু বেশি ছিল। যার কারনে তারা আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করলো না।

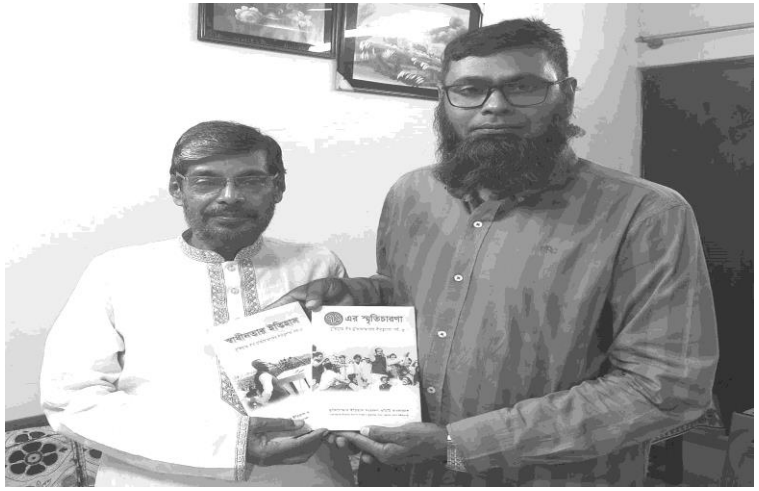

তারা পরে আত্মসমর্পণ করতে রাজি হলো কিন্তু সেটা ভারতীয় বাহিনীর কাছে করবে। তখন ৪ঠা ডিসেম্বর মিত্র বাহিনীর কাছে তারা আত্মসমর্পণ করল এবং সেই সাথে দেবীদ্বার থানা পুরোপুরি পাকিস্তানি বাহিনী মুক্ত হলো। তাদেরকে তখন চান্দিনা পাইলট স্কুলে জায়গা দেওয়া হলো পরে ক্যান্টনম্যান্টে নিয়ে যাওয়া হলো। ডিসেম্বরের ১২ তারিখ চান্দিনা থানার মাইঝখারের ফাওই নামক একটা জায়গার গর্ত থেকে কতক্ষণ পর পর গুলি ছোঁড়ে। তখন আমরা চারদিক থেকে ঘেরাও করলাম। সেখানে ৭ জন পাকিস্তানি সৈন্য ছিল। দুপরের পর থেকেই তুমুল লড়াই সন্ধ্যার ঠিক আগে তারা সাদা পতাকা উঠিয়ে আত্মসমর্পণ করার জন্য রাজি হলো। এই যুদ্ধে আমার সাথে তখন আমারই এক ক্লাসমিট সে সেনবহিনীর সদস্য ছিল। ঢাকা ক্যান্টমেন্টে বন্দি অবস্থায় থাকার পর সে পালিয়ে গিয়ে আমাদের সাথে মুক্তিযোদ্ধে অংশগ্রহণ করে। তারা যখন আত্মসমর্পণ করছে তখন সে ভালো উর্দু বলতে পারতো যেহেতু সে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ছিল। সে গিয়ে পাকিস্তানীদের সাথে হাত মিলালো এবং কথাবার্তা বললো, তখন একটা ঘটনা ঘটলো। এর আগে আমি কিন্তু তাকে বার বার বলতেছি যে, তুমি এগোবে না। তাদের অস্ত্রের থেকে তাদেরকে আগে দূরে নেই। অস্ত্রের থেকে নিরাপদ দুরুত্বে তারা যাক তারপর তুই যাবি। সে অতি আবেগ তাড়িত হইয়া তাদের সাথে উর্দ্ধুতে কথা বার্তা বলতে গিয়ে ওই ভুলটা করলো আমার নিষেদ স্বত্বেও, কেননা তখন আমি এই যুদ্ধটার নেতৃত্ব দিচ্ছিলাম। এরমধ্যে তখন নির্যাতিত মানুষগন তাদের যার যা আছে সেসব লাঠিসুটা নিয়ে পাকিস্তানীদের উপরে ঝাপিয়ে পড়লো। আমি কোনো ভাবেই তাদের থামাতে পারলাম না। আর সেখানে কিছু লোকজন ছিল যে তাদেরকে পিটিয়ে তাদের মালামাল লুট করার জন্য। সত্যেও খাতিরে এটা না বলে পারলাম না। চরম মূহুর্তেও বাঙালির এই ধরনের মনমানসিকতা ছিল। পাকিস্তানিরা যখন দেখলো যে তাদের নিশ্চিত মৃত্যু তখন তারা আবার ব্রাশ ফায়ার করলো। আমার যে বন্ধুটা তার নাম ছিল সৈয়দ আহমদ বাড়ি ছিল চান্দিনা থানার নাওতলা গ্রাম। একটা গুলি তার উরু ভেদ করে বেরিয়ে গেল এবং সে আহত হয়ে পড়ে গেল। পড়ে যাওয়ার পরে সে তার নিজের জামা খুলে বেধে রক্তটা বন্ধ করার চেষ্ঠা করলো। তখন ছিল শীত কাল। তো সেখানে আরেকজন পাকিস্তানী মিলিটারী সে এসে বেওয়ানেট চার্জ করে তার বুকটা ছিড়ে ফেলল। তখন তো তার আর কিছু করার নাই এবং সাথে সাথেই সে মারা গেল। তখন অন্ধকার নেমে গেছে আর বুজতেও পারছি না যে কি হচ্ছে। গুলাগুলি যখন থামলো তখন আমরা যারা যেভাবে পারি চলে গেলাম ওখানে আর রইলাম না। সকাল বেলা ওখানে গেলাম এবং গিয়ে দেখি যে ৭ জন পাকিস্তানীর মরা দেহ পড়ে আছে আর আমাদের মুক্তিযুদ্ধাদের মধ্যে একজন মুক্তিযুদ্ধা ও আরো একজন ছিল সেও মুক্তিযুদ্ধাদের ইপিআর এর। সে তখন যশোর ক্যান্টনম্যান্ট থেকে পালিয়ে

গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ইন্সট্রাক্টর হিসেবে ক্যাম্প করেছে। সেও ওই যুদ্ধে এসেছিল, তার চুলের কাটিং ছিল মিলিটারিদের মতো। তখন তার চেহারা আর চুলের কাটিং দেখে অনেকে মনে করছে যে এই লোকটা মিলিটারি। তো তার লাশও ফেলে রেখে আমার যে বন্ধু শহীদ হয়েছে তার লাশ নিয়ে মিছিল করে মাধাইয়া গেলাম। সেখানে গিয়ে বিশাল জনতার মাঝে জানাযা দিয়ে নিজের হাতে তাকে মাধাইয়া হাই স্কুলের মসজিদের সামনে কবর দিলাম। বর্তমানে তার কবরটা মসজিদের ভিতরে। তারপরে যে লোক পরে আছে তার বাড়ি ছিল দেবিদ্বারের রাজামেহার(যেখানে আমার ক্যাম্প ছিল)। সেখানকার লোকজন যুদ্ধ ক্ষেত্রে গিয়ে তার লাশ সনাক্ত করলো, করার পরে তাকেও মিছিল করে নিয়ে যেয়ে কবরস্ত করলো। ১৬ই ডিসেম্বর বিজয়ের প্রাক্কালে এই ঘটনাটা ঘটল। নিজের চোখের সামনে চার পাচঁ জন পাবলিক সহ আমার বন্ধু মারা গেল। আর সেখানে যে ৭ জন পাকিস্তানি মারা গিয়েছিল তারা যে ডুবা থেকে গুলাগুলি করতেছিল তাদেরকে ওই ডুবার মধ্যে মাটিচাপ দিলাম। এটা আমার সর্বশেষ যুদ্ধ ছিল। আমি এটা নিয়ে মোট তিনটা যুদ্ধের মুখোমুখি হয়েছি। আর জীবনের ঝুকির মুখোমুখি হইছি কমপক্ষে সাত বার। প্রতি বারই শত্রুর মুখোমুখি হয়েছিলাম। আমি পূর্বে একটা অভিনয়ের কথা বলেছিলাম। আমাদেরকে বলা হতো যে গ্যারিলারা হবে "রাফ টাফ ইন্টালিজেন্ট" মানে বোকা সোকা চতুর মানুষ। চলনে বলনে থাকবে বোকা কিন্তু আসলে সে থাকবে অত্যন্ত সুচতুর ও বুদ্ধিমান। "রাফ টাফ ইন্টালিজেন্ট" এটা ছিল আমাদের একটা মন্ত্র। আমি বাঙ্কার গোনার জন্য গেলাম রিকশা চালকের বেশ ধরে। এর আগে আরেকটা ঘটনা হইছে যে আমি যখন সেখানে ইন্ডিয়া থেকে এস চান্দিনা থানার প্রপারে ঢুকি তখন রাস্তায় দাড়িয়ে পাকিস্তানীরা গাড়ি থামিয়ে ডান্ডি কার্ড চেক করে। তারা এতো মূর্খ ছিল (ডান্ডি কার্ড মানে পরিচয় পত্র) যে তারা লেখাপড়া জানতো না, এটাকে উল্টে পাল্টে ধরে হাত দিয়ে মেপে দেখতো যে ঠিক না বেঠিক। এই মানুষ গুলি আমাদেরকে চব্বিশটা বছর শাসন নামে শোষণ করে গেছে। তারা হাত দিয়ে মাইপা দেখতো যে সঠিক কি না। অনেকে ডান্ডি কার্ডের বিপরীতে রেশন কার্ড দেখাইয়া ও তাদের ফাঁকি দিয়ে চলে যেত। তো ওদের সামনে গিয়ে আমি পরছি। তখন রিক্সাওলাকে বললাম যে তুমি বসো সিটের মধ্যে আমি চালাই। আমার একটা ছেড়া গেঞ্জি গায়ে আমি রিক্সা চালাইতেছি তখন একটা মিলিটারি আমারে দেখে বলতেছে "এছে কিউ, জোরসে চালাও" মানে আমাকে জোরে চালানোর জন্য বলল। তখন আমি বেঁচে গেলাম। আমার ব্যাগের মধ্যে কিন্ত জয় বাংলার পেস্টার, মুক্তিযোদ্ধের কাগজপত্র এইগুলো ছিল। যাক এভাবে বেঁচে গেলাম এবং ভাবলাম যে একতরফা যেহেতু বাঁচছি থানার ভিতরটা একটু দেখে যাই। থানার সামনে নিয়ে রিক্সাটা রাখলাম। সেখানে দেখি যে রাজাকার এই গরমের দিনে উলের মুজা পরে রাবারের

নাগড়া জুতা পরে দাড়িয়ে আছে। মিলিটারির গাড়ি যারা আমাদেরকে চেক করতেছিল তারা পাছ করতেছে। সে তাদেরকে স্যালুট দিতে যাইয়া রাইফেলযে ফালাইছে সেটা গিয়ে তার পায়ের উপর পরছে। এখন মিলিটারির সামনে তো আর কিছু করতে পারে না, তারা যাওয়ার পরে সে ব্যাথায় কাতরাতে শুরু করছে। সে আমারে দেয়খা হ্যাই করে দিছে একটা ধমক। তো আমি বললাম যে আমি একটু পানি খাব। সে বলতেছে তোমার জন্য পানি এখানে কেউ রাখছে। ওই ভিতরে কল আছে ওখানে গিয়ে খাও। আমি তো মনে মনে এটাই চাচ্ছিলাম আর এদিকে চান্দিনা থানা আমার অতি পরিচিত। কলটা কোথায় আছে আমি জানি আর কলটার কাছে যেতেই চান্দিনা থানার ভিতরের পুরাটা দেখা যায়। যাওয়ার সময় দেখি ব্যারাকের মধ্যে বেশ ভুড়ি ওয়ালা একটা পাঞ্জাবী শুয়ে আছে আর নাক ডাকতেছে। তার পাশে রাজাকাররা ছিল এরাও দিব্বি ঘুমাইতেছে। আমি কলের কাছে গিয়ে পানি খাওয়ার ভান ধরে কল চাইপা একটু পানি খাইলাম আর চারপাশে দেখে চলে আসতেছি। এর মধ্যে দেখি ওই ভুরিওয়ালা যে পাঞ্জাবী সে একটা বদনা হাতে বাথরুমের দিকে যাচ্ছে এবং সে আমারে দেখে খুব রাগে বলতেছে "এ ইহাছে কেয়া মাংতাহে, সিকিউরিটি কিদার হে" মানে সে বোঝাচ্ছে যে আমি এখানে কেমনে ঢুকলাম। এটা বলে তার পায়খানার বেগের কারনে দৌড়ে চলে গেছে। আমি এদিক থেকে বের হয়েছি এখন রাজাকারটা দেখলাম যে আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে রইছে। আমি দেখলাম যে ঘটনা খারাপ, যদি সে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাহলে আমি ধরা পইরা যাব। আমি কি করলাম পানি খাইছি তাই মুখ মুছতে মুছতে পড়নের যে লুঙ্গিটা ছিল সেটা উঠাইয়া মুখ মুছতেছি। লুঙ্গি উঠানের পরে নিচের অংশ তো উলঙ্গ। সোজা কথা আমার মতো একটা কালা ছেলে মানুষের অঙ্গ দেখার শখ তো আর তার নাই। তো উনি দেখছে যে আমি একটা বেক্কল। তা না হইলে লুঙ্গি উঠাইয়া ল্যাংটা হয়ে কে মুখ মুছে। সে দিল আমারে একটা কইশা চর, যে বেক্কল লুঙ্গি নামা। আমি তো নির্লিপ্ত ভাবেই লুঙ্গি নামাইয়া বললাম জ্বি স্যার। স্যার বলার পরে দেখলাম যে তার একটু পদমর্যাদা বাড়লো এবং মনে মনে নিজেরে একটু ভাব নিল। আর আমারে ভাগ কইয়া দিল একটা ধমক। আমি এদিকে চাচ্ছি যে সে আমাকে ধমক দেক মাইর দেক যাই দেক কিন্তু আমি যাইতে পারলেই হয়। এই একটা বোকার অভিনয় করেছিলাম। জীবনে মঞ্চ নাটক করেছি, টিভি নাটকও করেছি। সেদিন এই নাটকের কোনো পান্ডুলিপি ছিল না, কোনো পরিচালক ছিল না। নেপথ্যে থেকে যিনি এই নাটক করতে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তিনি হলো জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কারন আমি মনে রেখেছিলাম যে আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি.....। আমি এই কথাটাকে মনে রেখেই দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করেছি। যুদ্ধের পরে ১৯৭২ সনের ৩ শে জানুয়ারী ঢাকা স্ট্যাডিয়ামে

আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গবন্ধুর পদতলে অস্ত্র জমা দিছি। উনার সাথে হাত মিলানোর সৌভাগ্য হয়েছে। আমি আবার বললাম যে আপনার এই কথাটাকে আমি মনে রেখেছি, তখন উনি পিঠের মধ্যে হাত চাপড়িয়ে স্নেহ করলেন আর বললেন যে তোমরা যার যার কাজে চলে যাও। সেখান থেকে বের হয়ে চলে গেলাম। আমরা কিছু চাওয়া পাওয়ার জন্যে যুদ্ধ করি নাই, আমাদের কোনো বেতন ছিল না। আর ভাতাভোগি সৈনিক ও ছিলাম না। যারা মুক্তিযুদ্ধে গেছে তারা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই গেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের দেশ প্রেমে কোনো ঘাটতি ছিল না। এটা যে যাই বলুক আর যাই করুক। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সুবিধাবাদী লোকজন আমাদের চরিত্র হননের চেষ্ঠা করেছে।

আমি এখনও আশায় বুক বেধে আছি যে জীবনের শেষে সত্যের জয়টা দেখে যাব। আর আমি সব সময় একটা কথা সবাইকে বলি, নতুন প্রজন্মকেও বলি এই দেশটা স্বাধীন করে এনে দিয়েছি। কারো দয়ায় এই দেশ স্বাধীন হয় নাই। আমাদের কষ্ট করতে হয়েছে। মৃত্যুকে স্মরণ করার কথা সবাই বলে, মৃত্যুকে স্মরণ করি কিন্তু মৃত্যুকে ভয় পাই না। পাই না এই কারনে যে আজ থেকে ৫১ বছর আগেই ১৯৭১ সালে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছি। এই ৫১ বছর বোনাসে বেঁচে আছি। শেষ জীবনটায় বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা গড়ার জন্য সারাজীবন ত্যাগ স্বীকার করেছেন আর তার ডাকে যে একটু কষ্ট করেছি সেই সোনার বাংলা যদি দেখে যেতে পারি। আমরা চালিয়ে যাবো, নতুন প্রজন্মকে ও আমি আহবান জানাবো জীবনের শেষ লগ্নে এসে যে সোনার বাংলা গড়ার জন্য আমাদের অসমাপ্ত কাজগুলি করার জন্য যেন তারা এগিয়ে আসে।

"জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু" বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

বীর মুক্তিযোদ্ধা
আবু তাহের মো. মুনির উদ্দিন
ফেনী

১৯৬৯ এ আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে যখন আন্দোলন শুরু হয়, আমরা আট ভাই বোন তখন আব্বা আম্মার সাথে মোহাম্মদপুরে থাকতাম, আমার আব্বা ছিলেন পাকিস্তান পুলিশের অফিসার। হরতালের দিনে আমি হাঁটা শুরু করতাম হাঁটতে হাঁটতে মোহাম্মদপুর থেকে জগন্নাথ কলেজ, আবার জগন্নাথ কলেজ থেকে মিছিল নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসতাম বটতলায়, এটা ছিল আমাদের প্রতিদিনের কর্মকাণ্ড, আমাদের ভিতরে প্রথম যে কয়জন গ্রেপ্তার হই তার মধ্যে আমি ছিলাম, আমার সাথে ডেইলি ষ্টার এর মাহফুজ আলম টিটু ছিল, ঢাকা ইউনিভার্সিটির আফতাব ভাই ছিল, আরো কয়েক জন ছিল যাদের নাম মনে করতে পারছি না। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আমি আমার দল ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে নানান জায়গায় মিটিং করেছি। নূরে আলম সিদ্দিকী ভাই, আসম আব্দুর রব ভাইয়ের সাথে, আমরা তখন ঐক্যবদ্ধ ছিলাম। নানান জায়গায় মিটিং মিছিল করে বেড়াতাম। আমি খুব চিকনা ছিলাম এক জায়গায় এমন হলো যে আমাকে বলা হলো শেখ কামাল আসছে, শেখ কামালের বক্তৃতা দিতে হবে, আমি সেখানে শেখ কামাল সেজে বক্তৃতা দিলাম। স্থানটা ছিল জামালপুরের ইসলামপুর। ৭০ এর নির্বাচনে জয় লাভের পরে আমরা বিভিন্নভাবে আন্দোলন করতাম ক্ষমতা পাবার জন্য। ৭০ এর ২৩ ডিসেম্বর আমার আব্বা বললো মুনির এর জন্য আমার অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে, ওর জন্য বাসায় পুলিশ আসে এখন আর্মিও আসবে। ওকে বাড়ি থেকে বের করে দেও, ঠিক সেদিনই ছাত্রলীগের সেন্ট্রাল কমিটির একটা মিটিং হল এবং মিটিং এর সিদ্ধান্ত হলো যার যার ট্রেনিং হয়ে গেছে এখন তোমরা যার যার এলাকায় চলে যাও এবং এলাকায় গিয়ে এলাকাকে সংগঠিত করো। তখন আমি দেখলাম যেহেতু আব্বা আমাকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলেছেন আবার পার্টি থেকে সিদ্ধান্ত হল যার যার এলাকায় গিয়ে এলাকার লোকজনকে সংঘটিত করার, তাই আমি আমার জেলা ফেনীতে চলে গেলাম এবং আমার বড় চাচার বড় মেয়ের

বাসায় গিয়ে উঠলাম এবং আমি আমার কর্মকান্ড চালাতে থাকলাম। এভাবে দিন অতিবাহিত হতে লাগলো। ৭১ এর ২৬ মার্চ সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠার পর দেখি রেডিও টিভি কোন চ্যানেল ধরতেছে না। চ্যানেল ঘুরাইতে ঘুরাইতে রেডিওর চ্যানেল আকাশবাণী কলকাতার চ্যানেলটি পেলাম, তখন খবর পড়ছিলেন দেব দুলাল বন্দোপাধ্যায়, খবরে শুনতে পেলাম বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছে। শুনতেই আমি রেডিও ফেলে দিলাম দৌড়, দৌড়ে আমি পাকিস্তান বাজার নামক একটা বাজারে গিয়ে দেখি জয় বাংলা স্লোগান দিতেছে। একজন চাচা একটা রাইফেল এবং একটা টুটুবোর নিয়ে সাইকেলে করে যাচ্ছে, আমাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন কই যাস আমি বললাম জয় বাংলায় যাচ্ছি। তিনি বললেন যাও, কাল রাতে আর্মি বের হয়েছে সকলকে অস্ত্র জমা দিতে বলেছে, আমি যাচ্ছি অস্ত্র জমা দিতে।

আমি ভাবলাম কি বলে পাগল অস্ত্র জমা দিতে যাচ্ছে, যাইহোক তার সাথে আমি দৌড়াচ্ছি দৌড়াচ্ছি যখন পাকিস্তান বাজারের কাছে এলাম আমি তার সাইকেলকে ধাক্কা দিলাম, সাইকেল সহ তিনি পড়ে গেলেন এবং আমি লোকজনকে বললাম সে তার জমা দিতে যাচ্ছে, তখন আমরা তার অস্ত্র নিয়ে নিলাম, আমি টুটুবোরটা নিলাম এবং তার ব্যাগের ভিতরে ছয়টা না আটটা গুলি ছিল সেগুলো নিলাম। আবার যেতে লাগলাম শহরের দিকে। যেতে যেতে কোর্টের পাশে দীঘি ছিল, সেখানে গিয়ে

দেখলাম অনেক লোক জমায়েত হয়েছে। স্বাধীনতার পক্ষে কে কি করবে না করবে গাইড দিচ্ছে, ঢাকা চিটাগাং রোডে অনেক বড় বড় কড়াই গাছ ছিল, সিদ্ধান্ত হল কড়াই গাছ কেটে রাস্তায় ফেলে রাস্তা ব্লক করে দেওয়ার। আমার কাছে যেহেতু টুটুবোর রাইফেল ছিল তাই আমি সেখানে অনেক সম্মানিত মুক্তিযোদ্ধা হয়ে গেলাম। যাই হোক আমি নেতৃত্ব দিতেছি কড়াই গাছ কেটে রাস্তা ব্লক করতেছি। আমাকে যারা চিনতো, যেমন ফেনীর ভিপি জয়নাল, তিনি বললেন মুনির এটা করো, মুনির ওটা করো। এর মধ্যে চলে আসলেন মেজর জাফর ইমাম। তিনি আসার পরে আমরা আরো সুসংগঠিত হলাম। কিছু ইপিআর আসল, এদিকে আর্মিরা কিন্তু এদিক থেকে বের হচ্ছিল না। আর্মিদের আমরা মোটামুটি ঘিরে রেখেছিলাম পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের ভেতরের দিকে। কিন্তু পহেলা এপ্রিল থেকে শুরু হল এয়ার স্ট্রাইপিং, আমার তো কখনো এয়ার স্ট্রাইপিং দেখি নাই। যখন এয়ার স্ট্রাইপিং হত বিকট শব্দ হতো, আমিতো একবার দীঘিতে লাফিয়ে পড়েছিলাম তখন আমার হাত থেকে টুটুবোরটা দীঘিতে পড়ে গিয়েছিল, অনেক খোঁজাখুঁজি করে ও আর পাইনি। দুই জন আনসার ড্রেনের লাইনে ঢুকে আর বের হতে পারে নাই ওখানেই মারা গেছে। আমরা গাছ কেটে মেইন রোড ব্লক করেছিলাম কিন্তু ওরা আসতেছিল বিভিন্ন ক্ষেতের ভিতর দিয়ে ট্যাংক নিয়ে। এবার শুরু হলো আমাদের পালানো, আমি বেলুনিয়া শহরের দিক হয়ে আমাদের বাড়ির দিকে গেলাম ইন্ডিয়ায় যাওয়ার চিন্তা নিয়ে। আমার বাড়ি থেকে তিন দিকেই ইন্ডিয়ার বর্ডার, তখন বাড়িতে বসে বসে কি করব সাইকেলে করে ইন্ডিয়া যেতাম এবং ইন্ডিয়া থেকে এদিকে মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এনে দিতাম। আর মাথয় আছে শধু কিভাবে যুদ্ধে যাব। এর পরে আগরতলা গেলাম, সেখানে ফার্মগেটের মিলন ভাই ছিল, সেখানে তাদের সাথে হোটেলে থাকতে লাগলাম কিন্তু টাকা পয়সা ফুরিয়ে গেল, তখন আমার বন্ধু শহীদ বাকী থাকত কলেজ টিলায়, সেখানে গেলাম তার ব্যাগ থেকে ৫০ রুপি চুরি করলাম। এর পর আমি, আজিমপুরের সজিব ওর ভাই শ্যামল, সাচ্চু মিলে রওনা দিলাম কলার ট্রাকে করে ধর্মতলায় ট্রেন ষ্টেশনে যাব বলে। যাওয়ার পথে রাস্তাটা পাহাড়ি উঁচু-নিচু আঁকা বাঁকা রাস্তা ছিল, ট্রাকের ঝাকিতে আমাদের ভিতরের দুইজন বমি করতে করতে অনেক খারাপ অবস্থা হয়ে গেল। ওরা যেতে পারলো না, আমি আর সাচ্চু কোন মতে ট্রেনের ভিড় ঠেলে ট্রেনের ভিতরে ঢুকলাম। ট্রেনে এতো ভিড় ছিল যে ট্রেনের টয়লেটে ও মানুষে ভর্তি ছিল। ৪ রাত ৩ দিনের জার্নি ছিল অনেক কষ্ট করে টিকে থেকে কলকাতায় পৌঁছালাম। উঠলাম হোটেল শ্রীনিকেতনে, সাচ্চু তোফায়েল ভাইয়ের কাছে গেল, ওবাদ ভাই, নূরে আলম সিদ্দিকী ভাই, ফরিদপুরের রব ভাই ছিল সেখানে। আমি আর ফরিদপুরের মাসুদ পেপার বিছিয়ে খাটের নিচে থাকতাম, অনেক মানুষ সেখানে জায়গায় সংকলন হতো না।

থাকতে থাকতে ওবাদ ভাই তোফায়েল ভাইকে বলতাম যুদ্ধে যাব, যুদ্ধে যাব, আমরা আসছি যুদ্ধ করতে। দুইদিন পরে আমাদের জানালো কাজ আছে দুইটা। কে কোথায় যাবা? একটা আছে এখানে ছাত্রদের সাথে, আর একটা ঢাকায় অপারেশন। ঢাকার অপারেশন টা ছিল আমেরিকান ডেমক্রেটরা বাংলাদেশ সরকারের কাছে একটা চিঠি পাঠিয়েছে, সেই চিঠিটা ঢাকা থেকে সংগ্রহ করে এনে আমাদের তখনকার প্রধানমন্ত্রীর তাজউদ্দিন সাহেবের নিকট জমা দেয়া। আমরা গেলাম প্রধানমন্ত্রীর কাছে তিনি আমাদের বুঝিয়ে বললেন এবং বললেন তোমরা কালকে যাবে। আমি, মোকাররম ভাই আর আনিস চলে আসলাম অনেক প্রতিকূলতা অতিক্রম করে গ্রীন রোডের ঠিকানায় নির্দশনা অনুযায়ী। মিঃ চৌধুরীর সাথে দেখা করলাম। তিনি আমাদের কতগুলো খাম দিলেন। আমি বললাম ঠিক আছে আপনি তো খাম দিলেন আমরা যদি এগুলো নিয়ে এই কার্ফিউয়ের ভিতরে চিঠিগুলো সহ পৌঁছাতে না পারি তখন আমি গিয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রী কে কি বলবো? তিনি এটা বললেন আপনি এটা নিয়ে যাবেন এগুলো বিষয় বস্তু হচ্ছে, আমরা আমেরিকানরা এখানে মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী বানাব, আমরাই সব কিছু করবো শুধু স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে আমাদের এইসব অপারেশনের কথা বলতে হবে। আমি সিগারেট কার্টুনের ভিতরে সেগুলো লুকিয়ে সিগারেটের ব্যবসায়ী সেজে ফেরার পথে নিজের বাসায় গেলাম, বাসায় গিয়ে দেখি কেউ নেই, আমি ডাকাডাকি করতে লাগলাম এর ভিতর কয়েকজন এসে বলল আপনার নাম কি মুনির? আমি বললাম আমি মুনির, তারা বললেন এক্ষুনি বাসা থেকে বেরিয়ে যান। এখন আপনার বাবা এলিফ্যান্ট রোডে একটি বাড়ি ভাড়া করে থাকেন, আপনাকে যে কতবার আর্মিরা এই বাড়িতে এসে খুঁজে গিয়েছেন তার অন্ত নেই, বাড়ির সব কিছু নিয়ে গেছে লুটপাট কওে যা ছিল। আমি এলিফ্যান্ট রোডের বাসায় আসলাম, মা সব সময় আমাকে চোখে চোখে রাখে। আমি কি ভাবে বের হবো বুঝতে পারছি না। আমার বড় ভাই মুহিত, তিনিও মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তাকে বললাম তুমি আমার কাপড় গুলো নিয়ে যাও বাসার কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবে তুমি আমার কাপড় গুলো লন্ড্রীতে দিতে যাচ্ছ। ওর পিছন পিছন বের হয়ে এসে আমি আবার রওনা দিলাম, এবার আমি একা। আমার সাথে যারা এসেছিল তারা থেকে গেছে। ক্যান্টনমেন্টে আসলে আমাকে ধরল, জিজ্ঞাসা করল এটা কি আমি বললাম সিগারেট এবং সিগারেট ব্যবসায়ের স্লিপ টা দেখালাম, ওরা তখন আমাকে কালেমা জিজ্ঞেস করল, আমি বললাম, আমাকে ওরা ছেড়ে দিল। যাইহোক ওখান থেকে আমি কুমিল্লায় গেলাম। কুমিল্লা গিয়ে আমার বড় মামার বাসায় ভাত খেয়ে হাঁটতে হাঁটতে রওনা দিলাম গোমতী নদীর পাড়ে। ৫ টাকা দিয়ে একটা কলাগাছ কিনলাম, কলাগাছের উপর ভেসে ভেসে অনেক কষ্টে নদী পার হয়ে অনেক দূরে গিয়ে উঠলাম। হাঁটতে হাঁটতে বর্ডার পার হয়ে ইন্ডিয়ার

ভিতরে পৌঁছাইলাম কোথায় থাকবো কিছু না পেয়ে একটা স্কুলের বারান্দায় গিয়ে হাতের ব্যাগটা মাথায় দিয়ে অনেক ক্লান্ত থাকার কারনে ঘুমিয়ে পড়লাম। এর মধ্যে একটা মজার ঘটনা ঘটলো। ঘুমাইতেছি এমন সময় বুঝতে পারলাম বৃষ্টি এসে আমার মুখে পড়তেছে, ওকে হালকা পানি পড়াতে ভালো লাগছে বিধায় আমি মজা নিতেছি চোখ বন্ধ করে। এরপর বুঝতে পারলাম বৃষ্টি বাড়ে আবার কমে, আমি চোখ খুলে দেখলাম একটা গাই গরু আমার পাশে দাঁড়িয়ে প্রসাব করতেছে আর ওইটা আমার মুখে আসতেছে আমি মনে করেছিলাম বৃষ্টি পড়ছে। তারপর তাড়াতাড়ি উঠে পাশে কলের পানি দিয়ে মুখ ধুইয়ে আবার রওনা দিয়ে কলকাতায় আসলাম। এসে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে দেখা করলাম। খামগুলো তাকে দিলাম তিনি খানগুলো নিয়ে তার পাশে ময়লা ফেলার একটা ঝুড়ি ছিল সেটার মধ্যে ফেলে দিলেন। আমি তাজউদ্দিন সাহেব কে জিজ্ঞাসা করলাম তাহলে আমাদেরকে কেন পাঠানো হলো। যেতে আসতে আমাদের দুইবার মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়তে হয়েছে। উনি কিছু না বলে পাশের একজনকে বললেন ওকে ২০০ টাকা দিয়ে দে। এই আমার মোড় ঘুরে গেল। পরে বুঝলাম উনি ওদের কে ও ঠান্ডা রাখলো আর এটা নিয়ে যেন ঘাঁটাঘাঁটি না সেটাও করলেন। কিন্তু এসবের পিছনে ছিল খন্দকার মোস্তাক, তখন আমার খুব মন খারাপ হয়েছিল, তখন তাজউদ্দিন সাহেব আমার অবস্থা দেখে আমাকে বললেন ঠিক আছে তুমি আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হও, প্রতি ক্যাম্পে গিয়ে খবর নিবে কি ধরনের লোক আসতেছে মুক্তিযুদ্ধে এবং এসব খবর নিয়ে তুমি আমাকে দিবে। আমাকে একটা হেলিকপ্টার দিলেন, একজন ওয়েল ট্রেন্ড প্যারা ট্রুপার্স দিলেন, এই চাকরিটা দিলেন আমাকে প্রধানমন্ত্রীর অফিসে, আমি কয়েকদিন করার পরে এইসব মনোটনাস কাজ ভালো লাগলো না, আমি ছিটকে গেলাম। আমি প্রধানমন্ত্রী তাইজুল ইসলাম সাহেবকে বললাম আমি চাকরি করব না আমি যুদ্ধে যাব। তখন উনিও আমার উপরে রাগ করলেন। তাজউদ্দীন সাহেব সাধারণত রাগ করেন না কিন্তু আমার উপরে রাগ করলেন এতো বড় একটা চাকরি দিলেন কিন্তু আমি না করে বলতেছি যুদ্ধে যাব। আমি আবার চলে গেলাম আগরতলা। সেখানে শহীদ মানিক ভাই, নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু ভাইয়ের সাথে দেখা হলো। তাদের মাধ্যমে আমার কিছু সিনিয়র ও আমার কিছু জুনিয়ার মিলে আমরা চলে গেলাম আব্দুল জলিল সাহেবের ইয়ুথ ক্যাম্পে। ওখানে কিছুদিন প্রশিক্ষণ নিলাম এরপর চলে আসলাম মেলাগড় ক্যাম্পে, সেখান থেকে আমাদের আবার পাঠানো হলো বাগমারা ক্যাম্পে।

ওখানে আমাদের তিন মাসের জন্য পাঠিয়েছিল কিন্তু তিনদিন পরে আমাদের আবার ফেরত পাঠিয়ে দিল। আবার মেলাগড় ক্যাম্পে আসলাম। সেখানে আমাদের সাথে ছাদেক হোসেন খোকা, আজম খান, আর্টিস্ট শাহাবুদ্দিন, মায়া ভাই, আলম, বাদল ভাই, আমরা একসাথে ছিলাম, এরাই ক্রাক প্লাটুনে ছিল। কয়েক দিন পর আমরা গ্রুপ আকারে দেশে প্রবেশ করি। আমাদের সাথে ফরিদপুর একটা গ্রুপ আর আরেকটা গ্রুপের কথা এই মুহূর্তে মনে পড়ছেনা। রওনা দিয়েছি, একটা ব্রিজের নিচ দিয়ে যেতে হয়। নারায়ে তাকবির আল্লাহু আকবার যদি বলে রাজাকাররা তাহলে আর্মি নেই, আর পাকিস্তান জিন্দাবাদ বললে আর্মি আছে, এভাবে লোকাল রাজাকাররা আমাদের সহযোগীতা করতো। এলএমজি সহ আরো অনেক অস্ত্র আছে আমাদের সাথে, আমাদের কে কি করবে। আমরা একটা খাড়ির মধ্যে ঘুমিয়ে আছি। সামনে রেল লাইন, ওই পাশেও বাংলাদেশ এই পাশেও বাংলাদেশ। হঠাৎ করে দেখি রাতের অন্ধকারে গুলাগুলি শুরা হয়ে গেছ। চারদিকে গুলাগুলি আর মর্টারের সেল পড়তেছে। চোঁখ খুলে দেখি আমি ছাড়া আর কেউ নাই নৌকায়। আমার নৌকার আসাদ, মামুন ভাই, টিপু ভাই, হাবিব ভাই ও কর্ণেল তৌফিক ছিল। যুদ্ধের পরে তৌফিক ভাই আর্মিতে গেছে। সেখানে কেউ নাই এদিকে নৌকা ভর্তি আর্মস। আমি লাফ দিয়ে পড়ে নৌকা ধরলাম। নৌকা ধরে দুই তিনটা ধাপ এগিয়ে খাড়িতে সাইড হয়ে গেলাম। এর মধ্যে আমার পা ঝোপ করে ধরে ফেলল। তখনতো তারুন্য শুরু সবে কলেজে পরি। পানির নিচে অনেক কিছু আছে আগে শুনতাম। তাহলে কি

শিকলই ধরল আমাকে। আমি নৌকাটাকে এক হাতে ধরে আরেক হাতে পা ছাড়াতে গেলে তখন আমার হাতও ধরে ফেলল। আমি তখন শরীরের সব শক্তি দিয়ে ওইটাকে টেনে তুলে দেখি যে টিপু ভাই। তখন টিপু ভাইকে বললাম, উঠেন নৌকায় উঠেন, টিপু ভাই বলল যে না আমি উঠতে পারবো না, আমার পরনে কাপড় নাই। তো উনাকে ধাক্কা দিয়ে উঠাইয়া দিলাম। পরে আমরা চইলা আসলাম। চিন্তা করতেছি যে এই রাত্রে কে খাওয়াবে। সেখানে স্থানীয় যারা ছিল তারা দুই এক জন করে নিয়ে খাওয়াতে চাইল। হঠাৎ করে একজন রিক্সাওয়ালা বলল যে আমি একজনকে খাওয়াতে পারব। তখন খুব বৃষ্টি পড়ছিল এদিকে আমি বলে উঠলাম যে আমি যাব তোমার সাথে। তার বাড়ি গিয়ে দেখলাম ১০ ফিট এবং ৫ ফিটের একটি তালপাতার ঘর। আর পিছনে একটা ছোট রান্না ঘর। তো আমাকে নিয়ে ঘরে বসাইছে এবং আমি হাটু গেড়ে বসছি। এখন তাদের কথা শুনতেছি, উনি তার বউকে বলতেছি আমি একটা মুক্তি আনছি এখন তাকে ভাত খাওয়াতে হবে। তার স্ত্রী বলতেছে, ভাত আছে কোনো ছালুন টালুন নেই। তখন রিক্সাওয়ালাটা বলতেছে যে বড় মুরগি টা কি হইছে? বউ বলতেছে ডিম পাড়তেছে, মুরগিরে ওমে বসামো। রিক্সাওয়ালা বললো সে থাক ডিম পাতি, তুই মুরগি বাইর কর। আমি ঠিক মুখটা তুইলে বলতে যাব যে কোনো কিছু দরকার নাই, আমাকে খালি ভাত, লবন, আর ডাইল দেন। এই বলতে বলতে শুনি যে "কা" মুরগি জবাই হয়ে গেছে। স্বাধীনতার পরে তাদের অনেক যায়গায় খুজেছি কিন্তু পাইনি। যাই হোক পরে বের হয়ে বিলের মধ্যে রাস্তা হারাই ফেলাইলাম। বিলের মাঝের ধান গাছ লেগে হাত গুলা ছিলে গেছিল। রাজাকারদের সাথে অস্ত্র নিয়ে অনেক কাহিনী হয়েছে। এর পর আমরা কুমিল্লার দিকে এক জায়গায় গিয়ে উঠলাম এবং এক রাত থাকলাম। চেয়ারম্যান এসে আমদের খাইয়ে দিল এবং অনেক দূরে একটা জায়গায় আমাদের ছেড়ে দিল। তারপর গোমতী নদী আর দেবীদ্বার হয়ে আসতেছি। সেখানে মাঝে মাঝে ছোট খালে কালভার্ট ছিল। আমরা একসময় একটা কালভার্টেও ঢুকছি আর ওদিক থেকে আর্মি ও আসছে। তখন আমরা কালভার্টের মাঝখানে ধরে ঝুলে পরলাম। আমাদের নৌকাটা ছিল খড়ির নৌকা। দুই সাইডে ছিল খড় আর মাঝখানে ছিলাম আমরা। এর পর এসে নামলাম আর আর্মিরা ওই দিনই ওই গ্রামটা পুড়িয়ে দিয়েছিল।

মানিক ভাই বলল যে গোয়াল ঘরে গর্ত করে আর্মস গুলা রেখে সবাই যার যার মতো ঢাকা চলে যাও, যখন তোমাদের এখানে প্রয়োজন হবে আমি ডাকবো। তারপর সবাই গেছে আসছে, এদিকে আমি একদিন গিয়ে এক রাজাকার চেয়ারম্যানের বাড়িতে উঠে পড়লাম। আমি বললাম যে আমাদের কোম্পানীর প্রায় দে দুই হাজার লোকজন আসার কথা আমি তো আগেই চলে আসছি। তখন তিনি বললেন যে বাবা দেখ আমি কারো ক্ষতি করিনি। তুমি যে নৌকায় আসছ, সে নৌকার করে চলে যাও আর তাদের আসতে মানা করো। তো আমি এই শুনে চলে আসলাম আর কখনো যাইনি। আর অপারেশনের কথা কি বলবো। অনেকে অনেক বড় বড় অপারেশন করেছি কিন্তু আমি সেরকম কোনো অপারেশন করিনি। তবে যে দুই জিনিস আমি করেছি সেগুলোর মধ্যে একটা হলো সেগুনবাগিচা থেকে একটা মেশিন হাইজেক করা (যেটার মাধ্যমে খবরের কাগজ ছাপানো হতো)। এই মেশিনটা দিয়ে কার কি খবর এগুলো খুজে ছাপানো হতো এবং সেগুলা মানুষের দরজার নিচে দিয়ে দিতো। আর ব্যাংক এ একটা অপারেশন করেছি। মেইন অফিস থেকে খবর আসলো যে খাবার দাবার কিছু নাই, পারলে কিছু টাকা পয়সা পাঠাতে। তো পয়সা দেওয়া মতো কোনো অবস্থা আমদের ছিল না। তাই আমরা ব্যাংক এ অপারেশন করে সেই টাকা পাঠাই। এছাড়াও ছোট খাট কিছু অপারেশন ছিল।

নতুন প্রজন্মের কাছে আমার কথা হলো তোমারা কোন ভাবে বিপথে যেওনা। বঙ্গবন্ধু যে আদর্শ নিয়ে দেশ স্বাধীন করেছিলেন সে আদর্শ নিয়ে তোমরা এগিয়ে চলো।

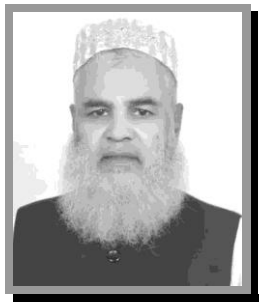

বীর মুক্তিযোদ্ধা

আলহাজ্ব শেখ মুহাম্মদ ইসহাক

ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক ফরিদপুর জেলা আওয়ামীলীগ
সাধারণ সম্পাদক সেক্টর কমান্ডার ফোরাম '৭১ উপজেলা সদর, ফরিদপুর।

বঙ্গবন্ধুর ব্যাক্তিগত ফটোগ্রাফার জনাব মূসা আহমেদ ২৭ শে মার্চ ১৯৭১ ঢাকা থেকে ফরিদপুরে আসেন পায়ে হেটে ও নৌকাযোগে বহুকষ্ট করে। কমলাপুরের সালাউদ্দীন আহমেদ মনির ছোট ভাই বকু ভাইয়ের বন্ধু হিসেবে (সালাহউদ্দীন আহমেদ মনি এবং বকু ভাই আমাদের সাবেক সংসদ সদস্য মরহুম ঈমাম উদ্দীন আহমেদ এর চাচাতো ভাই) তাদের বাড়িতে আসেন। আওয়ামী পরিবারের লোক হিসেবে তখন তারা আত্মগোপনে অবস্থান করছিলেন। সালাহউদ্দীন আহমেদ মনি আমার ভগ্নিপতি। তিনি তাঁকে রাত্রে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসেন। আমি সাধ্যমত তার সেবা যত্ন করি। পরের দিন ২৮শে মার্চ ১৯৭১ তিনি ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন। তাই তার বহনকৃত কিছু জিনিসপত্র আমার নিকট গচ্ছিত রেখে যেতে চাইলেন। একটি ২ ফিট লম্বা ও ১.১/২ ফিট চওড়া এবং ৩ ইঞ্চি গভীর স্টিলের বাক্স ভর্তি কিছু ছবির ফ্লিমের নেগেটিভ এবং বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের ২টি রেকর্ড ও নানাবিধ মূল্যবান ডকুমেন্টস সহ বাক্সটি আমার নিকট রেখে যেতে চাইলেন। আমি দ্বিধা দ্বন্দ্বের ভিতর রাজি হয়ে যাই। আমার ছোট ভাইয়ের নামও মুসা বলে তিনি আমাকে ভাই বলে সম্বোধন করেন। ফরিদপুরে তখনও পাক বাহিনী প্রবেশ করে নাই। মুলত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশ মতোই সারা দেশ পরিচালিত হচ্ছে, ফরিদপুর ও তার ব্যাতিক্রম নয়। তখন রাজেন্দ্র কলেজ, স্টেডিয়াম ময়দানসহ বিভিন্ন স্থানে স্বাধীনতার মূলমন্ত্রে দীক্ষীত হয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ চলছে। চারদিকে তখন থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে, কখন কি ঘটে কিছু বলা যায় না। আমার নিকটে গচ্ছিত বাক্সটি আমি ঘরের আলমারির মধ্যে সযত্নে রেখে দেই। মুসা ভাই ভারতের উদ্দেশ্যে চলে গেলেন। যাবার আগে আমার পিতার পা ছুয়ে দোয়া চাইলেন। আমিও আল্লাহর নিকট কামনা করলাম মুসা ভাই যেন সহি-সালামতে

ভারতে প্রবেশ করতে পারেন।

২১ শে এপ্রিল ১৯৭১ যখন পাক বাহিনী ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে মর্টারের গোলা নিক্ষেপ করে ফরিদপুর শহরের সীমানায় এসে পড়েছে, প্রাণ বাঁচাতে শহরবাসী দিক-বিদিক ছোটাছুটি করছে, তখন আমার একমাত্র চিন্তা হল আমি কি করে মুসা ভাই প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর মহা মূল্যবান ডকুমেন্টস রক্ষা করব। আমি আমাদের শোবার ঘরের খাটের নিচে পলেথিন মুড়িয়ে বস্তা দিয়ে জড়িয়ে মাটি খুঁড়ে মাটির নিচে পুতে ফেলি এবং ঘর লেপে মুছে স্বাভাবিক রূপদিয়ে ঘর তালা বন্ধ করে পরিবারের অন্যান্য সকল সদস্য সহ আমরা চর এলাকা আদমপুর গ্রামের এক আত্মীয় বাড়িতে আশ্রয় নেই। পরিবারের সকলককে সেখানে রেখে আমি আমাদের ফরিদপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে বিভিন্ন ভাবে দেশের শত্রু নিধনের কাজে লেগে যাই। সেখানে দীর্ঘ ২১ দিন অবস্থান শেষে শহরের অবস্থা যখন স্বাভাবিক হয় তখন আমি আমার পরিবারের সকলকে নিয়ে নিজ বাড়িতে ফিরে এলাম। বাড়িতে আসার পর বাক্সটি মাটির নিচ হতে আলো বাতাসে রেখে এবং তালের পাখা দিয়ে বাতাস করে এর আদ্রতা ফিরিয়ে এনে আলমারির মধ্যে পুনরায় তুলে রাখি। ১৯ মে ১৯৭১ রাতে মুসা ভাই ভারত হয়ে পুনরায় আমাদের বাড়িতে আসেন। ভারত হতে এক ব্যাচ মুক্তিযোদ্ধা বাংলাদেশে প্রবেশ করে তিনিও সেই দলের সঙ্গে বাংলাদেশে চলে আসেন এবং এক ব্যাগ গ্রেনেড নিয়ে আসেন এবং তার সঙ্গে একটি স্টেনগানও ছিল। দীর্ঘ পথ হেটে আসার ফলে তার পা দুটি ফুলে গিয়েছিল, ওনার সাহস দেখে তখন আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। একদিন আমাদের বাড়িতে আত্মগোপন থেকে বিশ্রাম নিয়ে পরের দিন তিনি

গ্রেনেডের ব্যাগ সহ ঢাকার উদ্দেশ্য রওনা হন। ঢাকায় ৪/৫ দিন অবস্থান করে আবার তিনি আমাদের বাড়িতে চলে আসেন। রাত্রে থেকে আবার পরের দিন ভারতের উদ্দেশ্য রওনা দেন। আবার ভারতের যাওয়ার আগে আমি তাকে বলি যে মুসা ভাই আমাদের এলাকায় স্বাধীনতার পক্ষের লোক খুবই কম। কেউ যদি আমার কাছে আপনার গচ্ছিত ডকুমেন্টের কথা জানতে পারে তাহলে আমাকে প্রাণে মেরে ফেলে এগুলো ছিনিয়ে নিতে পারে। আমি কিভাবে তখন আপনার দেয়া আমানত রক্ষা করব? তখন তিনি তাঁর কাছে থাকা স্টেনগানটি আমার নিকট দিয়ে যান আমার আত্মরক্ষার জন্য। দীর্ঘদিন মুসা ভাইয়ের সঙ্গে আমার আর কোন যোগাযোগ ছিল না।

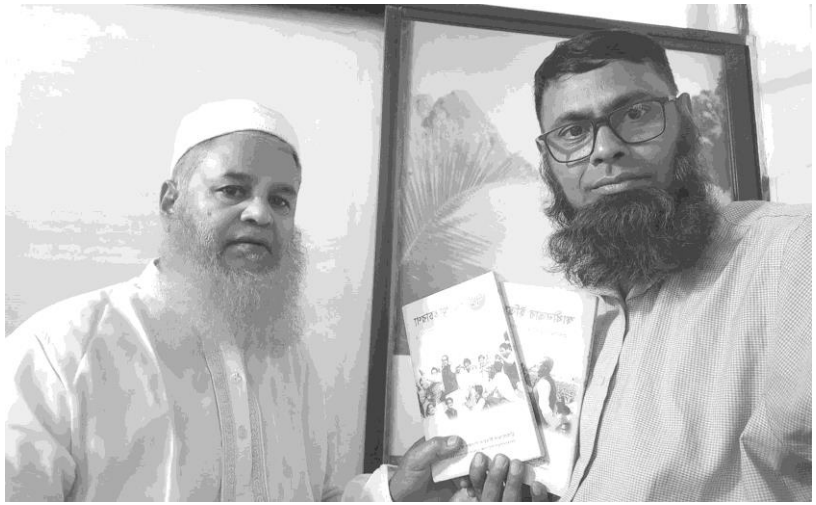

১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ২০ ডিসেম্বর সর্ব শেষ তিনি আমাদের বাড়িতে আসেন এবং আমার নিকট হতে তাঁর সেই মহামূল্যবান বাক্সটি ফেরৎ নেন এবং আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে কেঁদে ফেলেন। তিনি বলেন বঙ্গবন্ধুর রেডিও টিভিতে প্রচারিত সকল ডকুমেন্টস, মূল্যবান কাগজ, দলিলপত্র এবং স্থির চিত্রের ফ্লিমসহ ৭ মার্চের এতিহাসিক ভাষণের সবকিছু পাক বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসররা ধ্বংস করে ফেলেছে। আপনার নিকট রক্ষিত ডকুমেন্টটি একমাত্র সম্বল যা হতে হাজার হাজার কপি তৈরি করা যাবে, তিনি এটাও বলেছিলেন বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরলে তাঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিব। আমি যখন বীর মুক্তিযোদ্ধা সালাহউদ্দীন আহমেদ মনির নেতৃত্বে ঢাকা স্টেডিয়ামে অস্ত্র জমা দিতে যাই তখন ঢাকা স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে মুসা ভাইকে দেখতে পেয়ে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে আবেগের বশে তাঁর নিকট ছুটে যাই। অত্যান্ত ব্যাস্ত থাকায় এবং নিরাপত্তাজনিত কারণে তখন আমাকে সময় দিতে না পেরে

রাত্রে কোথায় থাকব তা জানতে চান? আমরা ক্রীড়া ভবনে অবস্থান করছি বলে তাকে জানাই। তিনি রাতের বেলা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন ও আমাকে অনেক আদর যত্ন করেন এবং কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নিজ হাতে আমাকে মুজিব বাহিনীর সার্টিফিকেট আমার হাতে তুলে দেন। যা আজও আমি অতি যত্ন সহকারে আগলে রেখেছি। নির্মম হলেও সত্য আমার প্রাণাধিক প্রিয় মুসা ভাই ইতিমধ্যে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। তার কথা আমার খুব মনে পড়ে, মনে পড়ে সেই দুর্বিসহ বিভীষিকাময় ভয়াল দিনের কথা। আমি তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করি ও আল্লাহর নিকট দোয়া প্রার্থনা করি তিনি যেন দেশের এই অকুতোভয় বীর সৈনিককে বেহেস্তে নছিব করেন। মাঝে মধ্যে ভাবতে ভাল লাগে আমি সেই ব্যাক্তি, আমি আমার জাতির পিতার মহা মূল্যবান ৭ মার্চের ভাষণের দলিল নিজের জীবন বাজি রেখে রক্ষা করার সুযোগ পেয়েছিলাম। নিজেকে গর্বিত মনে করি এই ভেবে যে, আমার জন্যই বর্তমান প্রজন্ম এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বঙ্গবন্ধুর দেশের জন্য যে ত্যাগ যে ভূমিকা তার সঠিক ইতিহাস জানতে পারবে।

জয় বাংলা জয়বঙ্গবন্ধু

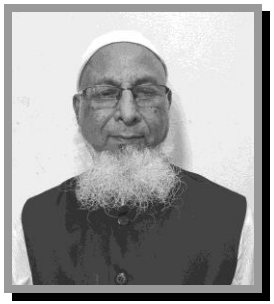

বীর মুক্তিযোদ্ধা

আলহাজ্ব মো. আকরাম আলী

পূর্ব আলিপুর, ফরিদপুর

সবেমাত্র ফরিদপুর ইয়াছিন কলেজে ভর্তি হয়েছি। ১৯৬৯ সালে অসহযোগ আন্দোলনের ফলে আইয়ুব খানের পতন হয়েছে। ইয়াহিয়া সরকার ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেন। নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ অংশ নেয়। বঙ্গবন্ধু নির্বাচনে প্রচারণার জন্য বরিশাল থেকে পথসভা করতে করতে ফরিদপুর হয়ে ঢাকা রওনা দেন। বঙ্গবন্ধুকে প্রথম দেখবো বলে ফরিদপুর পুরাতন বাসস্ট্যান্ডে আমার আব্বা আঃ জব্বার মোল্যা ও আমি উপস্থিত ছিলাম। বঙ্গবন্ধুকে দেখে আমার অনুপ্রেরণা আরও বেড়ে গিয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনে মনে হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে জাদু আছে। আমি ছাত্রলীগের সদস্য হিসেবে নগরকান্দা থানার কিছু অংশ ও বোয়ালমারী থানার কিছু অংশ নিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করি। গ্রামের স্কুলের কিছু ছেলে নিয়ে ৮/১০ জনের একটি দল তৈরি করে এ অঞ্চলের প্রতিটি হাটে টিনের চোং দিয়ে ৬-দফা ও ১১-দফার আলোকে প্রচার করি ও পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য তুলে ধরি। নৌকা মার্কায় ভোট দেয়ার জন্য অনুরোধ করি ও জয়বাংলা স্লোগানসহ অন্যান্য স্লোগান দেই। প্রথমদিকে তেমন কোন সাড়া না দিলেও পরবর্তীতে আমাদের সাথে অন্যান্যরাও সাড়া দেয়। এতে বুঝতে পারলাম মানুষ বঙ্গবন্ধুর কথা শুনতে ও দেখতে চায় (তখন দেখার কোন মাধ্যম ছিল না)। সন্ধ্যায় গ্রামে এই ছেলেগুলোকে নিয়ে নৌকা মার্কায় ভোট চাই। গ্রামের সাধারণ মানুষ আমাদের সাথে যোগ দেয়। কিন্তু মৌলভীর দল বাড়িতে এসে বাবা ও বড় ভাই এর কাছে নালিশ দেয়, বলে এদেশকে কী আপনারা হিন্দুস্থান করতে চান। আমার বাবা বঙ্গবন্ধুর একনিষ্ঠ ভক্ত, তাই কোন কর্ণপাত করেন না। বড় ভাই রাজেন্দ্র কলেজে জাফর ভাই এর সাথে ছাত্রলীগ করেন। প্রতিদিন আমার পরিবার আমাকে আর্থিকভাবে এ কাজে সাহায্য করতো ও উৎসাহ দিতো। মৌলভী সাহেবরা

বলাবলি করতো এরা নাস্তিক, পাকিস্তানের বিপক্ষে কাজ করে। নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৮৮টি আসন লাভ করে ও জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে। ইয়াহিয়া খান ১০ জানুয়ারী ঘোষণা করেন ৩ মার্চ ঢাকায় প্রথম অধিবেশন বসবে। কিন্তু ১ মার্চ এক ঘোষণায় অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করা হয়। আমাদের ফরিদপুরের তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা এ্যাডভোকেট শামসুদ্দিন মোল্যা, কে.এম ওবায়দুর রহমান, ইমামউদ্দিন আহমেদ, এডভোকেট মোশারফ হোসেন, এডভোকেট হায়দার হোসেন, এডভোকেট আঃ ছালাম, গৌর চন্দ্র বালা, অধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেন, নূরনবী ভাই এবং ছাত্রনেতা শাহ মোঃ আবু জাফর, সৈয়দ কবিরুল আলম, সালাউদ্দিন আহম্মেদ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের পরামর্শে ২ ও ৩ মার্চ হরতাল পালনসহ ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে মহাসমাবেশের বঙ্গবন্ধুর ভাষণের অপেক্ষায় থাকি। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক এক জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে আহবান জানান, "এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব, দেশকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।" তিনি আরও বলেন, "ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল। আমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়েই শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।" বঙ্গবন্ধুর ভাষণে সকলে অনুপ্রাণিত হয়ে অসহযোগ আন্দোলনে প্রতিদিনই মিটিং মিছিল সহ বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। ২৫শে মার্চ গভীর রাতে খবর পেলাম পাকবাহিনী রাজারবাগ, পিলখানা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্থানে বর্বরোচিত হামলা করে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারের পূর্বেই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন। যা বঙ্গবন্ধুর পক্ষে চট্টগ্রামের কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে আওয়ামী লীগ নেতা আঃ হান্নান ঘোষণা দেন। এরই ধারাবাহিকতায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও ছাত্র নেতাদের নির্দেশে ফরিদপুর স্টেডিয়াম ও রাজেন্দ্র কলেজে ট্রেনিং ক্যাম্প করা হয়। ফরিদপুর স্টেডিয়ামে আবু সাঈদ ইউসুফ, ছত্তার মন্ডলসহ আরও কয়েকজন ট্রেনিং দেয়। অপরদিকে রাজেন্দ্র কলেজের মাঠে ইউ.ও.টি.সি রাইফেল দিয়ে মোঃ মোকাররম হোসেন, মোঃ আবুল ফয়েজ সহ কয়েকজন ট্রেনিং দিতে থাকেন। আমি স্টেডিয়ামে ট্রেনিং গ্রহণ করি। অনেকেই ট্রেনিংপ্রাপ্ত হয়ে গোয়ালন্দ ঘাট, সিএন্ডবি ঘাট প্রতিরোধ ব্যবস্থায় অংশ নেন। আমরা গ্রাম থেকে অবসরপ্রাপ্ত আর্মি, পুলিশ, চৌকিদারদেরকে এনে দেই। তাদেরকেও প্রতিরক্ষার কাজে লাগানো হয়। ২১শে এপ্রিল ১৯৭১ পাক আর্মি ফরিদপুর আক্রমণ করে, গোয়ালন্দ হয়ে ফরিদপুর এসে সার্কিট হাউসে অবস্থান নেয়। আমি গ্রামের বাড়ি নগরকান্দার বিভাগদী (বর্তমান সালথা থানা) চলে যাই। খাড়দিয়ার আবুল কালাম আজাদ (বাচ্চু রাজাকার) ১০-

১২ জন সহযোগী নিয়ে আমাদের পাশে হিন্দু অধ্যুষিত নতুবদিয়া গ্রামে ব্যাপক লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে। পারিবারিক ভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো ভারতে যাওয়ার জন্য। একই পাড়ার আবু সাইদ খান রাজেন্দ্র কলেজের ছাত্র। তার সাথে পরামর্শ করি। বোয়ালমারীর জাফর ভাই এর সাথে আমরা ভারতে যাব।

তার পরের দিন বোয়ালমারী গিয়ে আমরা জানতে পারি জাফর ভাই ভারত চলে গেছেন। বিকেল হয়ে যাওয়ায় সাঈদ ভাই বাইখির গ্রামে তার আত্মীয়ের বাড়িতে গেলেন, আমি বাড়ি চলে এলাম। পরের দিন বাইখির গিয়ে শুনতে পাই সাঈদ ভাই বাড়ির লোকদের না বলে চলে গেছেন। মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমি বাড়ি এসে গ্রামের ৬/৭ জন ছেলে নিয়ে বাড়ির ভিতরেই লাঠিসোঠা দিয়ে নিজেরাই ট্রেনিং দিতে শুরু করি। সিদ্ধান্ত হলো প্রথমে আমি, ওহাব ও জাফর ভারত যাব। পরবর্তীতে আমার বড় ভাই আবু বকর রাজেন্দ্র কলেজের ডিগ্রী ছাত্র (সবাই তাকে বাকা ভাই বলে সম্বোধন করতো) কয়েক জনকে নিয়ে ভারত যাবে। নৌকাই ছিল তখন একমাত্র যানবাহন। পরের দিন আমার বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে চলা মাঠিআদা নদীর পাড়ে অপেক্ষায় ছিলাম। তখন জানতে পারি নৌকায় ভাংগার দুইটি হিন্দু পরিবার ভারতে যাচ্ছে, আমরা তাদের নৌকায় উঠে পরলাম। আরও ৬/৭টি নৌকা আমাদের নৌবহরে যুক্ত হলো। বোয়ালমারী থানার সাতৈর ইউনিয়নের ঘোড়াখালী রেলওয়ে ব্রীজ। ৬/৭ জন রাজাকার যারা এই ব্রীজটি পাহারা দিচ্ছিল তারা আমাদের নৌকাগুলিকে আটকায় এবং আমাদের নৌকা থেকে নামিয়ে গাছের সাথে বেঁধে ফেলে। আমরা ভয় পেয়ে যাই, কারণ যেকোন সময় ট্রেনে পাক আর্মি চলে আসলে আমাদের মেরে ফেলবে। ভাংগার ভারতগামী পরিবারগুলোকে বললাম, কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে তাদের কাছ থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য। প্রায় এক ঘন্টা পার হয়ে গেল। একজন রাজাকার আমার

সামনে এসে বলে, তোমার বাড়িতো বিভাগদী। আমার লোকটিকে দেখে চেনা চেনা মনে হলো। কারণ আমি কাদেরদি স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়াকালীন সময়ে যে বাড়িতে লজিং থাকতাম, লোকটি ঐ বাড়ির রাখাল ছিল। তাকে বললাম যেভাবে হোক আমাদের বাঁচান। তুমি কোথায় যাবে? আমি বললাম, মধুমতি নদীর ঐ পাড়ে আমার মামা বাড়িতে যাব। তোমাদের নৌকা কোনটি? আমি দেখিয়ে দিলে আমাদের নৌকাটি ছেড়ে দিল। আমার সহযাত্রী পরিবারটি আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো। আমাদের নৌকাটি যশোর আড়পাড়া যেতে যেতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। আড়পাড়ায় অপেক্ষারত অনেক শরণার্থীদের সাথে আমরাও আড়পাড়া স্কুলে থেকে গেলাম। রাতেই স্কুলে কয়েকজন লোক এসে প্রস্তাব দিলো, কিছু টাকা-পয়সা দিলে আমাদের রাস্তা পার করে দিবে। আমরা ভোর রাতেই রওনা হলাম। রোড পার হয়ে ঐ'পাড় যেতেই দুই দিক থেকে ফায়ার শুরু হলো। যার কাছে যা ছিল ফেলে দিয়ে আমরা দৌড়ানো শুরু করলাম। কিন্তু পথ এতো কর্দমাক্ত ছিল যে দৌড়ানো যাচ্ছিল না। হঠাৎ একটি গাছের শিকড়ে বেঁধে আমি পড়ে গেলাম। উঠে আবার দৌড় শুরু করতেই টের পেলাম আমার পায়ে কিছু হয়েছে, দেখি! পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলীর নখটা উঠে গেছে। ব্যাথায় হাঁটতে কষ্ট হলেও গন্তব্যে পৌছাতে হবে। বড় একটি বিল এর পাড় দিয়ে ভারতের বাঘদা বর্ডারে পৌছলাম। বর্ডার পার হয়ে ঐ'পাড়ে যেয়ে মাঠের মধ্যে শুয়ে পড়লাম আর দাড়াতে পারছি না। আধাঘন্টা পরে লাইনে দাড়িয়ে চিড়া ও গুড় নিলাম। চিড়া-গুড় খেয়ে সবাই বনগ্রামের দিকে রওনা হলাম। বনগ্রাম ফরিদপুর ক্যাম্প নামে পরিচিত স্থানে পৌছাতে রাত ১১ টা বেজে গেল। একতলা বিল্ডিং কেউ নাই। আমাদের তিনজনের মধ্যে ওহাবের বয়স বেশি ছিল। সে পূর্বেও নতিবদিয়া গ্রামের হিন্দু পরিবারের সাথে ভারতে আসা-যাওয়া করেছে। ক্যাম্পের আশেপাশে পরিচিত কাউকে পেলাম না। আধা মাইল দুরে ইতি পূর্বে ভারতে যাওয়া নতিবদিয়া গ্রামের এক হিন্দু পরিবারে বাড়িতে আমরা আশ্রয় নিলাম। তারা ওহাবের পরিচিত, আমার বাবাকে চিনতেন। দরিদ্র পরিবারটি রাতে আমাদেরকে বারান্দায় থাকতে দিল এবং ভাত-ডাল খেতে দিল। প্রায় একদিন না খেয়ে থাকার কারণে, সেই খাবারই আমাদের কাছে অমৃত মনে হচ্ছিল। আমার পা ফুলে যাওয়ায় পরদিন হাঁটতে পারলাম না। ঐখানেই থেকে গেলাম। আমরা যে বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম তার এক ভাই থাকে রানাঘাট, পেশায় চিকিৎসক। তার কাছে উনার ছেলেসহ আমাদেরকে পাঠিয়ে দিলেন। যথারীতি ট্রেনে রানাঘাট পৌছলাম। স্টেশনের পাশেই ডাক্তার বাবুর বাড়ি। আমরা সে বাড়িতে উঠলাম। আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল নয়। ঘরের একপাশে চেম্বার করে রোগী দেখেন ও ওষুধ বিক্রী করেন। চারদিন ঐ বাড়িতে থেকে চিকিৎসা নিয়ে পা একটু ভাল হল। রানাঘাট থেকে কল্যাণী আসলাম। কল্যাণী শরণার্থী ক্যাম্পে খাদ্য বিভাগের ইন-চার্জ

কানাইপুর এর আলী ভাই। তাঁর সাথে আলাপ করে জানতে পেলাম ট্রেনিং ছাড়া অস্ত্র পাওয়া যাবে না। যথারীতি কল্যাণী যুব ক্যাম্পে ভর্তি হলাম। অনেকেই বললো, তারা বেশ কিছু দিন আছে কিন্তু ট্রেনিং নিতে পারে নাই। তাদের কাছ থেকে জানতে পারি স্থানীয় এম.পির অনুমতিপত্র ছাড়া ট্রেনিং এর লোক নেয়া হয় না। আলী ভাইকে বিষয়টি জানালে তিনি লোক পাঠিয়ে কে.এম ওবায়দুর রহমান ভাইয়ের কাছ থেকে অনুমতিপত্র এনে দিলেন। কিন্তু রিক্রুটিং টিমের লোক আর আসে না। এভাবে প্রায় ১৫দিন কেটে গেল। দুইবেলা পি.টি করি আর কি? একটি রিক্রুটিং এজেন্ট এসে সকলকে লাইনে দাড়াতে বললো। আমাদের তিনজনের মধ্যে আমাকে শিক্ষাগত যোগ্যতায় সিলেক্ট করলো। কিন্তু জাফরকে ও ওহাবকে সিলেক্ট করল না। কিন্তু আমরা তিনজন একসাথে ট্রেনিং নিতে আগ্রহ প্রকাশ করলাম। এক মাস কেটে গেল। নতিবদিয়ার রবিন নামের ছেলেটি ব্যবসার কাজে সপ্তাহে ২বার বাংলাদেশ ও ভারত আসা-যাওয়া করে। তার কাছ থেকে আমাদের বাড়ির খবরাখবর পাই। আমার বড় ভাই রবিনের মাধ্যমে খবর দিয়েছে অস্ত্রের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আমরা যদি ট্রেনিংএ না যেতে পারি তাহলে যেন বাড়ি ফিরে আসি। খবরটা পেয়ে আমরা তিনজন আবার বাড়ি ফিরে আসলাম। এক চেয়ারম্যানের মাধ্যমে ২টি রাইফেল যোগাড় করা হয়েছে। এছাড়া তৎকালীন কায়েদে আজম কলেজের (বর্তমান শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ) প্রফেসর আবুল কালাম আজাদ একটি পিস্তল ও স্টেনগানসহ আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী সাঈদ ভাইয়ের বাড়িতে এসেছে। তিনি সাঈদ ভাইয়ের মামাতো ভগ্নিপতি আমাদের বাড়িতে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিছুদিন এভাবেই চলছিল। আমি ও বন্ধুবর কাজী সালাউদ্দিন ইয়াছিন কলেজের ছাত্র ছিলাম। আমার বাড়ির এলাকা অনেক নিরাপদ, তাই সালাউদ্দিন লোক পাঠিয়েছে, বিস্তারিত জানতে। সালাউদ্দিনকে ঠিকানা দিয়ে আসার জন্য বলা হল। ইতিমধ্যে শাহ্ মোঃ আবু জাফর ভাই, মধুখালীর কাইয়ুম ভাই, সিংহপ্রতাপের আতিয়ার, বোয়ালমারীর সিদ্দিক ভাই সহ ৬/৭ জন নৌকায় আমাদের বাড়িতে আসে। জাফর ভাই বিস্তারিত আলাপ করার পর নগরকান্দার কিছু অংশের দায়িত্ব বাকা ভাইকে দেন আইন-শৃংখলা ও সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেয়ার জন্য। কারণ ইতিমধ্যে কয়েকটি বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। আওয়ামী মনোভাবাপন্ন ও ছাত্রলীগ করে এমন পরিচিতদের ডাকার জন্য লিস্ট করা হলো এবং আমাদেরকে লিস্ট ধরে ডাকার জন্য দায়িত্ব দেয়া হলো। যথারীতি ৪/৫টি নৌকা নিয়ে লিস্ট অনুযায়ী ডাকা হলো। নির্ধারিত রাত্রে আমাদের বাড়িতে যারা উপস্থিত হলেন তারা হলেন, কাকিলাখোলার ওহিদ, রামকান্ড়পুরের মানিক মিয়া, কোন্দাদিয়ার মোকাদ্দেস, গট্টির মুকুল মিয়া, সালথার ইউনুস মিয়া, নগরকান্দার আজিজ মোল্যা, ভাংগার বড় আবু, সহিদ, তালমার শহিদ, বোয়ালমারীর টোকন, সোনাপুরের

বদউজ্জামান, বাঘারকান্দির মালেক, নকুলহাটির বাদশাহ প্রমুখ সহ প্রায় শতাধিক লোক জমা হলো। জাফর ভাই ও প্রফেসর আবুল কালাম আজাদ তাদের সাথে বিস্তারিত আলাপ করলেন ও পরামর্শ দিলেন, আমাদের ট্রেনিং ক্যাম্প বাড়ি থেকে সরিয়ে নতুবদিয়া প্রাইমারী স্কুলে নিলেন এবং সেটা উদ্বোধন করলেন। ফরিদপুরের আবুল হোসেন ভাইকে ট্রেনিং দেয়ার জন্য দিলেন। এরপর মিরাজসহ আরও কয়েকজন ক্যাম্পে আসে। এছাড়া ভারত থেকে ট্রেনিংপ্রাপ্ত হয়ে যে মুক্তিযোদ্ধাগণ এ এলাকায় আসেন, তাদেরকে বাড়িতে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ট্রেনিং ক্যাম্পে নিয়ে তাঁদেরকে দিয়ে ট্রেনিং করানো হয়। অক্টোবর মাসের দিকে খবর এলো, একটি ডিম্যুনেশন টিম আমাদের বাড়িতে আসবে, দুপুরে তাঁরা খাবেন। টিম প্রধান মোহাম্মদ আলী দেওয়ান, বাড়ি শরীয়তপুর। বাখুন্ডা ব্রীজ সম্পর্কে তাদেরকে বিস্তারিত ধারণা দেওয়া হলো। প্রায় ১৫০ পাউন্ড এক্সপ্লোসিভ দিয়ে বিস্ফোরক তৈরি করলেন। আমাদের লোকবল কম থাকায় সিদ্ধান্ত হলো, বিকালবেলা কমান্ডার হামিদ ভাইকে এ কাজে সাহায্য করার জন্য তাদেরকে বিনোকদিয়া পৌছে দেয়া হলো। এভাবেই চলতে থাকে। ইতিমধ্যে কমান্ডার কাজী সালাউদ্দিন, ডেপুটি কমান্ডার মেজবাহ্উদ্দিন নৌফেল, ডাক্তার রুনু ভাই সহ প্রায় ২০-২৫ জন এসে আমাদের বাড়িতে হাজির হন। থাকার সংকুলান না হওয়ায় ৬/৭ জনকে সাঈদ ভাই এর বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করা হলো। পরবর্তীতে তাদেরকে নতিবদিয়া গ্রামের পশ্চিমদিকে সূর্য্য মন্ডলের বাড়িতে দুইটি টিনের ঘরে ক্যাম্প করে দেয়া হলো। আবার আলফাডাঙ্গার কমান্ডার হিমায়েত উদ্দিন তালুকদার তার দলবল নিয়ে আমাদের বাড়িতে আসলেন। তাদেরকে নতিবদিয়া ক্যাম্পে একসাথে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। আমরা নতিবদিয়া স্কুলের ট্রেনিং ক্যাম্প বন্ধ করে কাজী সালাউদ্দিন বাহিনীর সাথে একত্রিত হয়ে কাজ করার অঙ্গীকার করা হলো। এখন অস্ত্র-গোলাবারুদে, লোকবলে গেরিলা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। দ্রুত অপারেশন শুরু করা প্রয়োজন। সিদ্ধান্ত হলো কানাইপুর ব্রীজ অপারেশনের জন্য। আমি শুক্রবার রেকি করলাম, ৪ নভেম্বর কানাইপুর ব্রীজ আক্রমণ করা হলো। দুই দলে বিভক্ত হয়ে একদল পূর্ব পাশে কানাইপুর গোরস্থানের পাশ থেকে ও অন্যদল পশ্চিম থেকে ব্রীজ আক্রমণ করা হলো। রাজাকাররা বাংকারের মধ্য থেকে গুলি করতে থাকে। অন্যদিকে পাক আর্মি অনেক দুর থেকে ফায়ার করতে করতে আসতে থাকে। অবস্থা বেগতিক দেখে ব্যাক করে আমাদের উভয় দল নতিবদিয়া ঘাঁটিতে চলে যাই।

করিমপুর ব্রীজে গ্রেনেড চার্জ: ৭ নভেম্বর রাতে দুই দিকে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে করিমপুর ব্রীজে আক্রমণ করা হয়। ঢাকা-খুলনা মহাসড়ক বিধায় বেশি সংখ্যক রাজাকার দল দিনরাত পাহারা দিত। কাজী সালাউদ্দিনের নেতৃত্বে নওফেল, আবু

বকর, খোকন, আলী, সিরাজ, খলিল, শাহাদৎ, ওহাব, আইয়ুব ও আমি সহ ১২/১৩ জনের দল। অন্য দলের নেতৃত্বে ছিল হেমায়েত উদ্দিন তালুকদার। বাদশাহ পাট্টাদার, শামসুদ্দিন, দেলোয়ার, রমেন, মমিন, চাঁন মিয়া, মিরাজ, জাফর, আবুবকর (বাকা ভাই), ইদ্রিস, সোহরাব, বাশার, ফরিদ সহ প্রায় ১৫ জনের দল করিমপুর ব্রীজ আক্রমণ করি। ব্রীজের উত্তর দিক থেকে খোকন গ্রেনেড চার্জ করলে দুইজন রাজাকার নিহত হয়। আমরা দুইটি রাইফেল হস্তগত করি। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল পাক হানাদারদের ভয় দেখানো। আক্রমণ শেষে আমরা নিরাপদে ঘাঁটিতে ফিরে আসি।

কামারখালী ঘাটে আক্রমণ ও ফেরি নিমজ্জন: আমি ও ইদ্রিস কামারখালী ঘাটে রেকি করে এসে বিস্তারিত তথ্য ও ম্যাপ আমাদের বাড়িতে অবস্থানরত নৌ-কমান্ডো মোহাম্মদ আলী ও আবুল কাশেমকে রিপোর্ট করি। এই মুক্তিযোদ্ধা দল কৌশলে অপারেশন সম্পূর্ণ করে আমাদের বাড়িতে নিরাপদে ফিরে আসে।

৯ ডিসেম্বর ফরিদপুরের করিমপুরে যুদ্ধ: কমান্ডার হেমায়েত ভাই এর সাথে নতুন করে ২জন ই.পি.আর ও ২জন পুলিশ বাহিনীর সদস্য এলএমজি, ল্যান্ডমাইন, হ্যান্ড গ্রেনেড, অনেক ভারী অস্ত্র-শস্ত্র সহ যোগ দেন। এতে আমাদের মনোবল আরও দ্বিগুন বেড়ে যায়। কাজী সালাউদ্দিনের জীবিত পাক আর্মি ধরা খুব ইচ্ছা। ইতিমধ্যে খবর আসে, করিমপুর ও ধোপাডাঙ্গা-চাঁদপুর রোডে করিমপুর গাড়িয়াল ব্রীজে ১৫/১৬ জন রাজাকার থাকে। তাদের আর্মস এ্যামুনিশন নিয়ে আত্মমর্পন করবে। আপনারা ধোপাডাঙ্গা-চাঁদপুর বাজারে আসেন। খবরটি শুনে খুব বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো না। রাত্রে সকলে একত্রিত হলে আমি বললাম, রেকি করে বিষয়টির সত্যতা জানা হোক। কিন্তু সালাউদ্দিন ও আরও কয়েকজন মানতে নারাজ। সকাল ৮ টায় আনুমানিক ৩০/৪০ জন মুক্তিযোদ্ধা সালাউদ্দিনের নেতৃত্বে ধোপাডাঙ্গা-চাঁদপুর বাজারে ৯টার দিকে পৌছে যাই। কিন্তু এখানে কোন রাজাকার বা সংবাদদাতাকে খুজে পাওয়া গেল না। স্থানীয় লোকজন জানায়, গতকাল এখানে পাক আর্মি এসেছিল, আজও আসতে পারে। তবে আপনারা সামনে বড়ঘাট নামক স্থানে চলে যান, ঐখানে পজিশন নিতে সুবিধা হবে। দলবলসহ বড়ঘাটে গেলে কাজী সালাউদ্দিন ভাইয়ের নির্দেশে আরও সামনে এগিয়ে যাই (বর্তমানে এ.এইচ জুট মিল অবস্থিত)। যথারীতি তিনভাগে বিভক্ত হয়ে রাস্তার পূর্ব পাশে আমিনুর রহমান ফরিদ, আতাহার, শরিফ, আলী, বাদশাহ, শামসুদ্দিন, ইদ্রিস, বাকা ভাই, শাহাদত, বাশার, আশরাফ, দেলোয়ার, বক্কার, আইয়ুব পুলিশ ও পশ্চিম পাশে নওফেল, খোকন, ওহাব, মজিবর, শামসুদ্দিন, মঈনুদ্দিন, হামিদ, খলিল, মোমিন ও সিরাজ এ্যামবুশ করে থাকে। হেমায়েত ভাই, জাফর ও আমি রাস্তার উপর ইট উঠায়ে ল্যান্ডমাইন স্থাপনের কাজ করছি। হিমায়েত ভাই ও জাফর মাইন স্থাপনের কাজ করছে, আমি রাইফেল নিয়ে কাভার

করে আছি। হঠাৎ করে পাকিস্তান আর্মির একটি জীপ আসতে দেখা যায়। কাজী সালাউদ্দিনের কাছে এলএমজি ও গুলি বহনকারী রমেন। অন্যদের হাতে ছিল এসএলআর, রাইফেল ও হ্যান্ড গ্রেনেড। দুই পাশ থেকে ব্রাশ ফায়ার সহ আমি সামনে থেকে ফায়ার শুরু করলে জীপটি পিছু হটে পালাতে থাকে। জীপে থাকা কয়েকজন গুলিবিদ্ধ হয় তা বুঝা যায় না। যশোহর ক্যান্টেনমেন্ট ফল করার পর পাকিস্তানের আর্মি কামারখালী ঘাট হতে ফরিদপুর পর্যন্ত রাস্তার উপর ফাঁকা জায়গায় অবস্থান করছিল। করিমপুর রাস্তার পার্শ্বেও তাদের অবস্থান ছিল। এই গুলির শব্দে পাকিস্তান আর্মিসহ রাজাকাররা তাদের বাংকার থেকে গুলি বর্ষণ করতে থাকে। বৃষ্টির মতো গুলি আসতে থাকে। তারই একটি গুলি হেমায়েত ভাই এর ডান হাতের মধ্যমা আঙ্গুলে লাগে। আমরা দ্রুত রাস্তার খাদে নেমে যাই। মুহূর্ত দেরি করলে আমরা সবাই ব্রাশফায়ারে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যেতাম। রক্ত ফিনকি দিয়ে বেরুতে থাকলে গেঞ্জি ছিড়ে আঙ্গুল বাঁধলেও রক্তে কাপড় ভিজে যাচ্ছিল। কিছুসময় অপেক্ষার পর দেখি পশ্চিম দিক থেকে গুলি আসছে। অর্থাৎ তিনদিক থেকে পাকবাহিনী আমাদের ঘিরে ফেলেছে। হেমায়েত ভাইকে দ্রুত চিকিৎসা দিতে হবে। আমরা ব্যাক-ফায়ার করতে করতে হেমায়েত ভাইকে নিয়ে রাস্তার পাশ দিয়ে পিছন দিকে ফিরতে থাকি। তাকে নিয়ে আজলবেড়া গ্রামের একটি বাড়ি থেকে কাপড় এনে আঙ্গুল ব্যান্ডেজ করে সেখানেই থাকতে বলি। আমি আবার ফিরে আসি। এদিকে রাস্তার পূর্ব পাশে যারা ছিল ফাঁকা মাঠ বিধায় তারা শেল্টার না পেয়ে কিছু রাস্তার কালভার্ট দিয়ে পূর্ব পাশ থেকে পশ্চিম পাশে আখক্ষেতের মধ্যে যায়। বাকি কয়েকজন ফিরে আসতে বাধ্য হয় এবং দুরে অবস্থান নেয়। আমাদের বাহিনী মাঝেমধ্যে গুলি ছোড়ে আর পাকিস্তান আর্মি বৃষ্টির মতো ব্রাশ ফায়ার করতে থাকে। বিকাল গড়িয়ে যায়।

আমাদের দল অর্থাৎ যারা রাস্তার পশ্চিম পাশে ছিল, স্থানীয় রাজাকাররা (করিমপুর ও কুশাগোপালপুর গ্রামে ১০/১৫ জন রাজাকার) করিমপুর ব্রীজের দক্ষিণ পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা দক্ষিণ দিকে গেছে ঐ রাস্তা দিয়ে পাক হানাদার আর্মিদেরকে পথ দেখিয়ে আমাদেরকে তিনদিক থেকে ঘিরে ফেলে। কয়েকজন অর্থাৎ খোকন, খলিল, বাদশাহ, সিরাজ, আইয়ুব, শাহাদাৎ সহ ৫/৬ জন ছোন ক্ষেতের ভিতর দিয়ে রাস্তার পাশ দিয়ে বের হয়ে আসতে সক্ষম হয়। কাজী সালাউদ্দিন গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পার্শ্ববর্তী বাকের মন্ডলের বাড়িতে আশ্রয় নিলে সন্ধ্যার দিকে পাকআর্মি ও রাজাকার দল কাজী সালাউদ্দিনসহ ওই বাড়ির ৩ জনকে গুলি করে মেরে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এছাড়া শহীদ মেজবাহ্উদ্দিন নওফেল (ফরিদপুর), শহীদ ওহাব (নিমতলি খানাখানাপুর, রাজবাড়ি), শহীদ মজিবর, শহীদ শামসুদ্দিন, বোয়ালমারীর শহীদ ময়েনউদ্দিন, পাড়াগ্রামের শহীদ হামিদ (খোলাবাড়িয়া, আলফাডাঙ্গা) ৩ জন সালাউদ্দিন কমান্ডের মুক্তিযোদ্ধা ও ৪ জন হেমায়েত কমান্ডের মুক্তিযোদ্ধা মোট ৭ জন শহীদ হয়। আমরা সকলেই কান্নাকাটি করছিলাম। কাজী সালাউদ্দিনের ভাই কাজী ফরিদের কান্না আর থামানো যাচ্ছিল না। সে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। পরের দিন সকালে বেশ কিছু লোকজন কাঠের তক্তায় করে মমিন (যার বাড়ি খোলাবাড়িয়া, আলফাডাঙ্গা) তার শরিরে বেয়নেটের খোচায় ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছে, বুট দিয়ে মাড়িয়ে তার বুকের পাজর ভেঙে ফেলেছে। তাঁকে নতিবদিয়া ক্যাম্পে নিয়ে আসে এবং ডাক্তার রুনু ভাই চিকিৎসা দেয়ার পর তাকে মুক্ত অঞ্চলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ১০ই ডিসেম্বর আমরা বিভাগদী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে গ্রামবাসীদের নিয়ে গায়েবানা জানাজা পড়ি। ১১ ডিসেম্বর শাহ্ মোঃ আবু জাফর ভাই লোক পাঠালে আমরা

নতিবদিয়া ঘাঁটি ছেড়ে বোয়ালমারী ডাকবাংলোয় অবস্থান করি। এখানে ৮নং সেক্টরের সাব-সেক্টর কমান্ডার ফ্লাইট লেফঃ জামাল চৌধুরী সহ আরও অন্যান্য কমান্ডারদরে সাথে পরিচিত হই। ১৬ই ডিসেম্বর সকালে আমরা মুক্তিযোদ্ধারা দুই দলে ভাগ হয়ে এক দল নতিবদিয়া হয়ে ফরিদপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হই। পথে আমরা পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের খবর পাই। বিজয়ের সংবাদ কানে আসছে, আমরা আনন্দে ফেটে পড়ব নাকি বন্ধু-স্বজন হারানোর দুঃখে ভেঙে পড়ব তা বুঝে উঠতে পারি না। সেই মুহূর্তটি কেমন ছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। গন্টির কাছা কাছি আসলে সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় মুকুল মিয়ার বাড়িতে রাত্রে অবস্থান করে সকালে ফরিদপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হই। ২য় দল মাঝকান্দি হয়ে ফরিদপুর পৌছায়। উল্লেখ্য যে, ফরিদপুর সদরের করিমপুরে যুদ্ধের মত ভয়াবহ এতবড় যুদ্ধ আর দ্বিতীয়টি হয় নাই। পরে জানা যায় উক্ত যুদ্ধে একজন অফিসার সহ বেশকিছু পাক হানাদার নিহত হয়। আমরা ফরিদপুর এসে করিমপুরে যুদ্ধক্ষেত্রে যাই। সেখানে শহীদ কাজী সালাউদ্দিন, মেজবাহউদ্দিন নওফেল সহ ৭জনের দেহাবশেষ নিয়ে আসি এবং আলীপুর গোরস্থানে যথাযোগ্য মর্যাদায় জানাজাসহ দাফন করি। পরবর্তীতে আমাদের অস্ত্র বায়তুল আমান মিলিশিয়া ক্যাম্পে জমা দেই।

বীর মুক্তিযোদ্ধা

নুরুল আমিন কাউসার

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

আমি দুই নম্বর সেক্টরের একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার পূর্বে আমার কিছু ইতিহাস না বললেই নয়, ৬৯ এর গণআন্দোলন থেকে আমি ছাত্র রাজনীতিতে জড়িত। আমাকে প্রথম ছাত্র রাজনীতি শিখিয়েছেন তৎকালীন রাকসুর মিজানুর রহমান ভাই, ৬৯ এর গণআন্দোলনে উনি আমাদের এলাকায় চলে যান, আমি তখন স্কুল শাখার ছাত্রলীগের সভাপতি, আমাদের এলাকাটা ছিল মুসলিম লীগ সমৃদ্ধ এলাকা, তখন আমাদের সিনিয়র এক ভাই অ্যাডভোকেট আব্দুল লতিফ তিনি পরবর্তীতে সংসদ সদস্য হয়েছিলেন, লতিফ ভাই ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এসে আমাদের হাতেগোনা কয়েকজনকে নিয়ে রাজনীতি করতেন। আমি সেই ৬৯ থেকে সচেতন ছাত্রলীগের কর্মী হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলন বা স্বাধীনতার আন্দোলনের জন্য সক্রিয় ছিলাম।

৭০ এর নির্বাচনে এমএনএ দেওয়ান আবুল আব্বাস এবং কাজী আকবর উদ্দিন সিদ্দিকী সাহেবের নির্বাচনে আমরা সরাসরি অংশগ্রহণ করি। তার মধ্যে আমি, হেলাল উদ্দিন ভূঁইয়া, মোতালিব, ইকবাল আহমেদ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছি। ৭০ নির্বাচনে জয়ী হবার পরের ইতিহাস সকলের জানা।

আমি অফিস পাড়া ছাত্র সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে এলাকায় প্রথম বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করি ২৩শে মার্চ। যেটা কয়েকটা পত্র পত্রিকাতে এসেছিল। এরপরে শুরু হলো মুক্তিযোদ্ধাদের কে সংগঠিত করা, ঢাকা থেকে যে সব মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়েরা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উপর দিয়ে আগরতলায় যেতেন তাদেরকে স্কুলে রাখা, খাবার দেওয়া, এবং সিএনবি পার করে তাদেরকে আগরতলায় পৌঁছে দেওয়ার কাজ গুলো এপ্রিল মাস পর্যন্ত আমরা করেছি। মে মাসে আমাদের থানায় পাকবাহিনী এসে ক্যাম্প করে, তখন আমরা বিভিন্ন এলাকায় চলে যাই থানা শহর

ছেড়ে। আমরা বিভিন্ন এলাকায় থেকে মিজান ভাইয়ের বাড়িতে সংঘটিত হয়ে মিজান ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে অনেককে সংগঠিত করে আমরা আগরতলা পাঠিয়ে দেই।

আমি জুন মাসের দিকে মিজান ভাইকে বললাম মিজান ভাই আমিতো যুদ্ধে যাব, তিনি বললেন ঠিক আছে তুই যা আমি তখন আগরতলার উদ্যেশ্য রওনা দিলাম বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে রাত ৮ টার দিকে আগরতলায় পৌঁছালাম। আগরতলা শহরে আমরা হাটতেছি এর মধ্যে দেখা হল কয়েকদিন আগে আমরা যাদের পার করে দিয়েছিলাম তাদের মধ্যে ফার্মগেটের মিলন ভাই, খোকন ভাই তারা শেখ কামাল ভাইয়ের বন্ধু ছিলেন। এর পরে মিলন ভাই ও খোকন ভাই আমাকে নিয়ে হোটেলে গেলেন। সেখানে আমাকে একদিন রাখলেন পরের দিন সকালে আমাকে বললেন তুমি কংগ্রেস ভবনে যাও সেখান থেকে আইডিকার্ড নিয়ে নওশিনগড় দেওয়ান আবুল আব্বাস সাহেবের ইয়ুথ ক্যাম্প এ যাও সেখান থেকে তোমাদেরকে প্রশিক্ষণে পাঠাবে, আমি কথা মত নওশিনগড় ইয়ুথ ক্যাম্পে চলে গেলাম, সেখান থেকে ১৫ দিন পরে আলম ভাইয়ের কথায় কলেজ টিলা গিয়ে কয়েক দিন থাকার পর রিক্রুটমেন্ট এর জন্য লাইনে দাঁড়ালাম কিন্তু আমাকে ছোট বলে রিক্রুট করলেন না, আমি ১০ম শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম তখন। আমাদের রিক্রুট না করলে আমি হুঁহুঁ করে কাঁদতে শুরু করলাম, তা দেখে আমাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আব্দুল কুদ্দুস মাখন ভাই জিজ্ঞেস করলেন এই তোর কি হয়েছে, আমি বললাম মাখন ভাই আমি খুব শখ করে এসেছিলাম যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবো কিন্তু আমাকে ছোট বলে রিক্রুট করছে না। তখন রিক্রুটমেন্ট অফিসার কে আব্দুল কুদ্দুস মাখন ভাই বলে দিলেন ও আমাদের খুব একনিষ্ঠকর্মী ওকে রিক্রুট করে নিন। রিক্রুটিং অফিসার মাখন ভাইয়ের সুপারিশে আমাকে রিক্রুট করলেন। আমাদেরকে বলা হলো পরের দিন আমাদেরকে প্রশিক্ষণ শিবিরে পাঠানো হবে তাই প্রস্তুতি নাও। আমাদের প্রশিক্ষণ হলো হাফলং এ। সেখান থেকে প্রশিক্ষণ শেষে মেলাগড়ের হেডকোয়ার্টার এ আসলাম। এরপর আমাদের গ্রুপকে অস্ত্র দিয়ে

বাংলাদেশের ভিতরে প্রবেশ করানো হল বক্সনগর এর ভেতর দিয়ে। সেখান থেকে আমরা রতনগড় গ্রামের একটা পরিত্যক্ত বাড়িতে ক্যাম্প স্থাপন করি। সেখান থেকে আমরা কয়েকটি সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি আমাদের গ্রুপ নিয়ে।

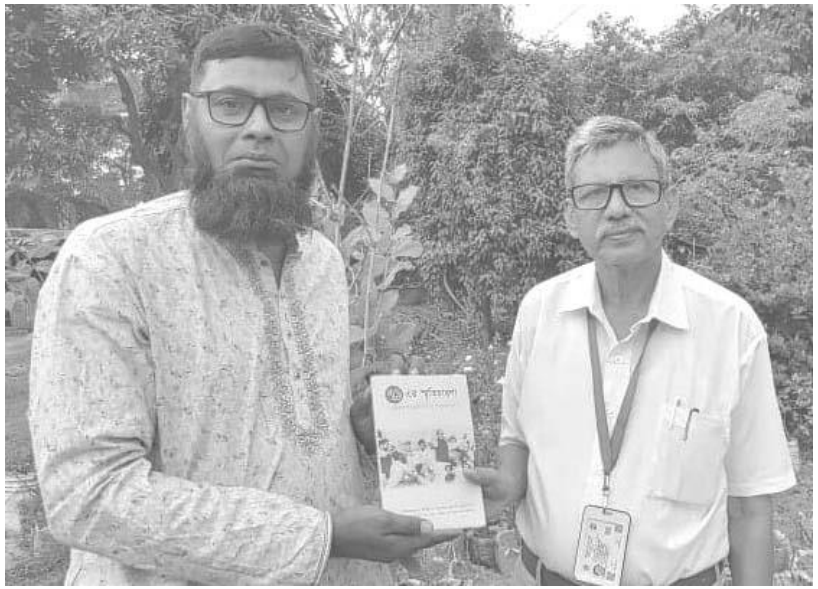

আমাদের এলাকায় ঝুঁকিদাড়া নামক স্থানে একটা ব্রীজ ছিল আমরা মুক্তিযুদ্ধরা সেটা ভেঙে দেই তখন পাক আর্মিরা একদিন খুব ভোর বেলা এসে আশেপাশের বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দিয়ে সেখানে অবস্থান নেয়। আমরা ওই এলাকার যারা মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম তারা খবর পেলাম, সেখানে সুবেদার গিয়াস ওস্তাদ ছিলেন উনি প্রথম তার গ্রুপ নিয়ে পাক আর্মিদেরকে প্রতিরোধ করে এরপরে আমরা সেখানে যাই এবং প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত পাক আর্মিদের সাথে আমরা সম্মুখ যুদ্ধ করি একপর্যায়ে পাক আর্মিরা পিছু হটে চলে যায়। এরপরে আমরা আমাদের ক্যাম্পে চলে আসি, এবং আশেপাশের কিছু ছোটখাটো অপারেশন চালাই। সর্বশেষ আমরা যে যুদ্ধটা করেছি সেটা হলো ১৪ ডিসেম্বর আমাদের থানা মুক্তকরণ যুদ্ধ, আমাদের আশেপাশের কমান্ডারদের একটা যৌথ সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে আমরা তিন দিক থেকে পাক আর্মিদের আক্রমণ করব কারণ পূর্বদিকে নদী ছিল ওরা ওদিক দিয়ে পালাতে পারবে না বাকি তিন দিক দিয়ে আমরা আক্রমণ করলে ফলপ্রসু হবে। সেই যুদ্ধের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সুবিধার মজিদ যিনি আর্মির অবসরপ্রাপ্ত ছিলেন তাকে এবং আমাদের বিএলএফ এর কমান্ডার লতিফ ভাইকে দায়িত্ব দেয়া হলো।

আমরা তিন দিক থেকে আক্রমণ করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হই, যুদ্ধের সময় আমাদের এক সহযোদ্ধা সালাম ভাই শহীদ হলেন, এর পরে আমরা চলে গেলাম নবীনগর,

নবীনগর শহর তখন মুক্ত কিন্তু শুধু থানা ও স্কুলে পাকিস্তানিদের বাঙ্কার রয়েছে। সেখানে তুমুল যুদ্ধের পরে সেগুলো মুক্ত হলো। পাক আর্মিরা চলে গেল তাদের ক্যাম্পে, পাক আর্মিদের ক্যাম্পটা ছিল আমাদের ইস্কুলের দোতালায়, সেখানে ১২ জন পাক আর্মি এবং কিছু মিলিশিয়া ছিল, তারা আত্মসমর্পণ করেছিল। এর পরে দেশ স্বাধীন হলে বঙ্গবন্ধু ফিরে আসার পরে ২০ শে জানুয়ারি স্টেডিয়ামে অস্ত্র জমা দিয়েছি।

বীর মুক্তিযোদ্ধা
মোড়ল বজলুল করিম
বাগেরহাট

১৯৭১ সালে ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ শোনার পর মনে মনে নিয়েছিলাম যুদ্ধের প্রস্তুতি। তারপর আরো বিশ্বাস হয়ে গেল ২৫শে মার্চ কাল রাত্র। ২৫ মার্চ কাল রাত্রে অসহায় বাঙালির উপর বিরতীহীন পাক সেনাদের গুলিবর্ষণ, তান্ডবলীলা, জ্বালাও পোড়াও লুটপাট হত্যা, তাই আমরা আর ঘরে থাকতে পারলাম না। আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী সংগঠিত হতে লাগলাম। এক পর্যায়ে আমরা অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মরহুম সুলায়মান মোড়ল, শেখ রুহুল আমিন, বারাশীয়া (ফকিরহাট) গ্রামের ইষ্ট বেঙ্গল রেজিঃ নায়েক আঃ কাদের, আমি নিজে ও আমার ছোট ভাই নূরুজ্জামান (তখন তার বয়স ছিল ১৫/১৬ বছর, সে ছিল আমাদের দলের সবচেয়ে ছোট), ফকির আজমল, মোঃ আজিজুল হক, আহম্মদ শেখ, নূর ইসলাম শেখ, আফজাল মোড়ল এবং পারকুরশাইল গ্রামের শেখ ইশারত আলী, শেখ নজরল ইসলাম, শহীদ শেখ হোসেন আলী, শহীদ মোড়ল, অহীদ শেখ, ইশারত শেখ মোট ১৬ জন আমাদের গ্রাম হতে কেউ কেউ দুপুরের খাবার খেয়ে না খেয়েই যুদ্ধের উদ্দেশ্যে গ্রামের উত্তর দিকে বিলের ভিতর দিয়ে মরহুম আঃ আজিজ মোড়লের খোলা বাচাড়ী নৌকায় করে হানাদার মুক্ত এলাকা দিগংগা বারুইগাতী হয়ে সারলিয়া রাজপাট আমাদের এক আত্মীয় মোঃ হাসেম মিয়া বাড়িতে রাত্র যাপন করি। ভোর রাতে পায় হেটে চুনখোলা গিয়ে নৌকা যোগে যশোর জেলার আড়পাড়া বরইচারা হয়ে কালিবাবু রোড (সিএন্ডবি) পার হয়ে দিনের বেলায় একটা আখ খেতে দিন যাপন করি। রাতে বাগদা বডারের কাছেই রাত্র যাপন করি। মাদারতলা নামক একটা বাজার পাই কিন্তু কোন বসতি দোকান ছিল না। পরের দিন সকালে বাগদা বডার পার হয়ে বাস যোগে বশিরহাট ক্যাম্প এ নাম লিখিয়ে ভ্যাবলা ক্যাম্পে অবস্থান করি। স্বসস্ত্র ট্রেনিংয়ের উদ্দেশ্যে আমাদের মধ্য

হতে ৩ জন ১) মরহুম সুলাইমান মোড়ল, ২) আফজাল মোড়ল ৩) শহীদ মোড়ল বিহার বীরভূম ট্রেনিং সেন্টারে যায়। পরে ওরা অন্য দলের সাথে ট্রেনিং শেষ করে বাগেরহাটের কান্দাপাড়ার আমজাদ মিঞার সাথে আসে। আমরা বাকি সবাই টেট্রা ক্যাম্পে অবস্থান করি। ৭/৮ দিন থাকার পর বিহার চাকুলিয়া স্বসস্ত্র ট্রেনিং এর উদ্দেশ্যে রওনা হই। একই সঙ্গে আমাদের ইউনিয়নের বাকপুরা গ্রামের শেখ লেয়াকত আলী, শেখ বেয়াজ উদ্দিন ছিল। এবং মোঃ আতিয়ার জোমাদ্দার, মোশারাফ জোমাদ্দার, নওয়াব আলী খা সহ আরো অন্যান্য ইউনিয়নের বীর মুক্তি সেনারা আমাদের সাথে ছিল। পূর্বেই আমাদের গ্রামের আহম্মদ শেখ এবং নূর ইসলাম শেখ কিছু জিনিসপত্র কেনার উদ্দেশ্যে ক্যাম্পের বাইরে আসে এবং পরবর্তীতে আর ক্যাম্পে ফিরে যায় নি। পরে বাকী সবাই স্বসস্ত্র ট্রেনিং নেয়ার জন্য ট্রেন যোগে চাকুলিয়ায় পৌছাই। এক মাস ট্রেনিং এর মধ্যে প্রতিটা ইভেন্টে আমি প্রতিযোগীতায় অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পাশ করি ও প্রথম স্থান অধিকার করি। রাইফেল সুটিং এ ১১টা উইংস ছিল এবং সেই উইংস গুলিতে সব প্রতিযোগী ট্রেনারদের মধ্যে আমি প্রথম স্থান লাভ করি। ২য় হয় বাকপুরা গ্রামের শেখ লেয়াকত আলী। ট্রেনিং শেষ করে বেগুনদিয়া ক্যাম্পে আসি। ওখানে মেজর এম এ জলিল (৯নং সেক্টর কমান্ডার) এর কাছে রিপোর্ট করার পর দুই-তিন দিন সেখানে থাকি। পরে ক্যাপ্টেন তাইজুল ইসলাম সাহেবের নেতৃত্বে ৯নং সেক্টরের অধীনে সর্ব বৃহৎ অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হয়ে শতাধিক মুক্তিসেনা বাগেরহাট শহরের উত্তর অঞ্চলে প্রধান ঘাটি করার উদ্দেশ্যে বড় ২টি বাস যোগে বাগদা বডার পার হওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হই। পথের মধ্যে আমাদের একটি বাস দূর্ঘটনায় সেটির মধ্যে আমি নিজে ও আমার ছোট ভাই সহ আরো অনেকেই ছিলাম। সেখানে আমরা অনেকেই আহত হই। বাসটি বিকল হয়ে গেলে পাশে থাকা ইন্ডিয়ান আর্মিদের ঘাটিতে সংবাদ পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গেই তাদের গাড়ী নিয়ে এসে আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে আমাদের অন্য গাড়ীটি সহ বাগদা বডার পার করে দেয়। আমাদের দলের ভিতর থেকে ৩জন খুব গুরতর আহত হওয়ার কারণে ঐ আর্মি ক্যাম্প হাসপাতালে চিকিৎসা অবস্থায় থেকে যায় এবং তাদের অস্ত্র আমরা নিয়ে আসি। আমরা বডার পার হয়ে নিরাপদ এলাকা দিয়ে খুব সতর্কতার সাথে সোর্সের মাধ্যমে দিনে সুন্দরবন এবং রাতে খুলনা জেলার তেরখাদা থানার এলাকা হয়ে শন্তোষপুর হাইস্কুলে এসে ঘাটি করি যা বাগেরহাট থানার অর্ন্তগত এবং সেখানে থেকে বিভিন্ন এলাকার পাক বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করি। প্রতিটা যুদ্ধে আমি অংশগ্রহণ করি। নাজিরপুর থানার রঘুনাথপুর ক্যাম্পে আক্রমণ করা কালীন সময়ে আমাদের সঙ্গী শেখ হোসেন আলী সহ ২ জন শহীদ হন। গোটাপাড়া, পানিঘাট, চিরলিয়া বিষ্ণুপুর, বাবুরহাট, বয়াসিংগা নামক এলাকায় পাক বাহিনীদের সাথে বিভিন্ন সময়ে সম্মুখ যুদ্ধ হয়। তাছাড়া চিত্রা নদীর এপার ওপার পাকবাহিনী এবং রাজাকারদের সাথে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ লেগেই ছিল। এর

ভিতর আমার স্মরণীয় গোটাপাড়া ও বাবুরহাট যুদ্ধে হানাদার বাহিনীদের পরাস্ত করে ওদের অনেকের লাশ নদী হতে উদ্ধার করি ও সাথে যুদ্ধকালীন সময়ের অনেক অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করি। আমরা যুদ্ধকালীন সময়ে নিজ এলাকায় না থাকার কারণে ঐ সময়ে রাজাকার ও হানাদার বাহিনীরা আমাদের পরিবারের অনেক ক্ষতিসাধন করেছে। রাজাকার বাহিনীর কমান্ডার রজব আলীর লালনকৃত রাজাকাররা আমাদের বাড়ি ঘর লুট-পাট ও জ্বালাও পোড়াও করেছে।

এভাবে পাক হানাদার বাহিনীর সাথে ৭/৮ মাসব্যাপী যুদ্ধ হওয়ার পর এক পর্যায়ে বাগেরহাটের বিভিন্ন এলাকার যুদ্ধে হানাদার বাহিনীরা পর্যাক্রমে পরাজিত হতে থাকে এবং ১৬ই ডিসেম্বর পাক বাহিনী ঢাকায় আত্মসমর্পণ করলে আমরা বাগেরহাট শহর মুক্তকরণ অভিযান অব্যহত রাখি এবং রাজাকার বাহিনীর প্রধান ফকির রজ্জব আলী তার দলবলসহ পালিয়ে যায় এবং ১৭ই ডিসেম্বর আমরা বাগেরহাট শহর দখল করি এবং বিজয় পতাকা উত্তোলন করি। আমরা বাগেরহাটে ক্যাপ্টেন তাইজুল ইসলাম এর নিকট আমাদের সকল অস্ত্র জমা দিয়ে ম্যালেশিয়া ক্যাম্পে থাকি (নূরল আমিন হাইস্কুলে) উল্লেখ্য ম্যালেশিয়া ক্যাম্পে থাকাকালীন আমি বিএইসএম পদে নিযুক্ত হয়ে দায়িত্ব পালন করি। পরে ক্যাম্প বিলুপ্ত হবার পর লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে আমি বাড়িতে চলে আসি।